তৃতীয় অধ্যায়

॥ বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের উন্মেষ পর্বের প্রধান নাটকাবলীর আলোচনা ॥

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১)

মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককেই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা দেওয়া হয়। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি হিসেবে এটি প্রথম নাটক এবং উল্লেখ যোগ্য ও বটে'।[1] মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীকে ঐতিহাসিক নাটক – রূপেই বিঘোষিত করেছেন। তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে স্পষ্ট করেই লিখেছেন, "for you must remember that the Play is a historical one" (মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী ১৯৭৩, পৃঃ ৩১৬)। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কেই আরেকটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'Fancy, only 5 or 6 males and but 4 females in a Historic Tragedy'. (মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃঃ ৩১৫) এখানে তিনি স্পষ্ট করেই কৃষ্ণকুমারীকে 'হিসটরিক ট্র্যাজেডি' বলে আখ্যাত করলেন। পত্রে তিনি জোরের সঙ্গে রাজস্থানকে ইতিহাস রূপে ধারণা করে বলেছেন, "I have tried to represent Juggut Sing as I find him in history".

(মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ পৃঃ ৩১৯) টডের রাজস্থানের প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায় থেকে তিনি নাটকের প্লট গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের 'অ্যানালস অব অম্বর'এর তৃতীয় অধ্যায় থেকে জগৎসিংহের চরিত্র গৃহীত হয়েছে। 'রাজস্থান' গ্রন্থকে যে আধুনিকমতে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা ইতিহাস বলা যায় না আমরা পূর্ব্বেই সে বিষয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছি। কৃষ্ণকুমারী উপাখ্যান রাজপুতানার ভাটদের মুখে মুখে যেরূপ প্রচারিত হয়েছিল তারই অনুলিপি টড সাহেব প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। এই বর্ণনায় যে কল্পনার প্রাধান্য নিশ্চিত ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মধুসূদন টডের গ্রন্থকে নির্বিচারে ইতিহাস মনে করেছিলেন বলেই তিনি সত্যাসত্য যাচাই করবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। আমাদের পক্ষে ও কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীর সত্যতা কতোটুকু সে বিচার করা সম্ভবপর নয়। কারণ আর কোথাও কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৪৪ ১৭৭৯ শকাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায়

১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – 'বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' (১৩৭৩) পৃঃ ৪৪৭

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কৃষ্ণকুমারী ইতিহাস' প্রবন্ধ নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা মিলনাত্মক এবং রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। টড বর্ণিত কাহিনীকে মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক বলে যদি ধরে নেওয়া যায় তবেই 'কৃষ্ণকুমারী'কে ঐতিহাসিক নাটক বলতে পারা যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন ঃ 'অবশ্য টডের রাজস্থানকে যদি ইতিহাস বলতে পারা যায় তবেই কৃষ্ণকুমারীকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়।'[২] ডঃ সুকুমার সেন ইতিহাস কাহিনীর সহিত নাটক কাহিনীর সম্পর্ক ক্ষীণ বলে মনে করে কৃষ্ণকুমারীকে ঐতিহাসিক নাটক বলতে রাজী হন নি[৩]। কিন্তু তাঁর এমত গ্রহণযোগ্য নয়। 'কৃষ্ণকুমারী'কে যদি ঐতিহাসিক নাটকরূপে খারিজ করতে হয় তবে কাহিনীর ঐতিহাসিক মূলক-তাতে সংশয় করেই করতে হবে। অন্যথায় নয়। 'রাজস্থানের' কাহিনীর সঙ্গে যে নাটকের কাহিনীর মূলগত মিল আছে তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। আমাদের মতে 'কৃষ্ণকুমারীর' কাহিনী দৃঢ় প্রামাণিক সত্যভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে 'কৃষ্ণকুমারী'কে বিষয়বস্তুর দিক থেকে যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক না বলে ইতিহাসাশ্রিত নাটক বললেই সুবিচার করা হয়।

টডের 'রাজস্থানে' বিবৃত আখ্যান থেকে মধুসূদন কিছু কিছু স্থলে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন করেছেন। মূল কাহিনীতে আছে যে পাঠান সর্দার আমীর খাঁ ও রাজপুত সর্দার অজিত সিংহ মানসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ অথবা কৃষ্ণার মৃত্যু দাবী করিয়াছিলেন।

'When the Pathan revealed his design, that either the Princes should wed Raja Maun, or by her death seal the peace of Rajwara..."[4]

- - নাটকে কিন্তু আমীর খাঁ মানসিংহের দলে যোগ দিলেন এ সংবাদ আছে কিন্তু অজিত সিংহের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তিনি রাজকুমারীর সঙ্গে মানসিংহের বিবাহ অথবা রাজকুমারীর মৃত্যু দাবী করেছেন এ কথা নেই। কৃষ্ণার মৃত্যুর রায় রাণা সর্বসম্মতিক্রমেই গ্রহণ করেছেন। মূলে আছে 'the fiat passed that Kishna Komari Shouild die' - কিন্তু নাটকে দেখানো হয়েছে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) (১৯৬০) পৃঃ ১৭৮

৩। সুকুমার সেন, 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) (১৩৭০) পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য

৪। J.Tod, - Annals and Antiquities of Rajasthan. Vol.1(London,1957) Page 368.

৫। Ibid. Page 368.

চিঠিতে কৃষ্ণার মৃত্যুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী ভীমসিংহকে বলেছেন ঃ"মহারাজ· এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথাথেকে লিখেছে আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধান পাচ্ছি না।" (৫ম অঙ্ক /১ম গর্ভাঙ্ক) হয়তো মন্ত্রীর – নিজেরই মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত পরিকল্পনা, সেটা গোপন করে তিনি অপরের নামে চালিয়েছেন। ভীমসিংহের ভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহ, মন্ত্রী আর রাজা এই তিনজন এ মন্ত্রণা জানেন কিন্তু মূলকাহিনীতে মনে হয় রাজা সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করেই প্রস্তাব নিয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু সম্বন্ধেও বলা হয়েছে – "A powerful opitate was presented the Kasoomba draught. She received it with a smile, wished the scene over, and drank it. The desires of barbarity were accomplished."She slept' ! a sleep from which she never woke."[6]

নাটকে কৃষ্ণা নিজে খড়্গাঘাত করে মৃত্যুবরণ করেছেন। নাটকে বিবৃত হয়েছে যে কৃষ্ণার মৃত্যুর পর পরই রানীও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মূলে একটু অন্যরূপ আছে।

"The wretched mother did not long survive her child; nature was exhausted in the ravings of despair; she refused food, and her remains in a few days followed those of her daughter to the funeral pyre."[7]

মূলের এই অলপস্বলপ পরিবর্তনে নাট্যকারের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই পরিবর্তন – নাট্যিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে কিনা কেবল মাত্র সেইটাই আমাদের বিবেচ্য। মধুসূদন ভিলেন আমীর খাঁ ও চন্দাবৎ এর মুখপাত্র কুটিল অজিতসিংহের ষড়যন্ত্র নেপথ্যে রেখেছেন ফলে নাটকের ঐতিহাসিক পরিবেশ ক্ষুন্ন হয়েছে। কারণ ঐতিহাসিক নাটকে এই ধরণের কুমন্ত্রনা দর্শক পাঠকের ঐ কৌতূহল সৃষ্টিতে সহায়তা করে। উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ প্রভৃতি ভাবাবেগ সৃষ্টির পক্ষে এরূপ একটি ষড়যন্ত্রের দৃশ্য তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত। নাটকে বর্ণিত হয়েছে, মন্ত্রী বলেছেন ঃ "রাজা মানসিংহ অগ্নি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।"

৬। J. Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan. Vol.I(London,1957), Page -369.

৭। Ibid. Page- 369.

(৫ম অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক) এই বিবৃতির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মাধ্যমে আমীর খাঁ ও অজিত সিংহের কার্যকলাপ দেখালে তা অধিক জীবন্ত হত বলাবাহুল্য। কৃষ্ণকুমারীর বিষপানে মৃত্যুকালের বীরত্ব ব্যঞ্জক উক্তি, "Why afflict yourself, my mother, at this shortening of the sorrows of life ? I fear not to die ! Am I not your daughter. Why should I fear death ? We are marked out for sacrifice from our birth, we scarcely enter the world but to be sent out again; let me thank my father that I have lived so long." [8]

এর পরিবর্তে পদ্মিনীর আহ্বানের স্বপ্নদৃশ্য কল্পনার ফলে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর ভয়াবহতা অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। আত্মত্যাগের মহিমায় করুণরসের তীব্রতা ভাবাবেগে পূর্ণ হয়েছে। সে তুলনায় ভীমসিংহের উন্মাদ হয়ে যাওয়া, রানীর আকস্মিক মৃত্যু প্রভৃতি কল্পনা কিছুটা চমক সৃষ্টি করলেও প্রশংসনীয়। তা করুণ রস সৃষ্টিতে পোষাকতা - করেছে।

কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে মধুসূদন আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "The story of Krisna though tragic is barren of incidents" -

(মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী ১৯৭৩। পৃঃ ৩১৬) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই মত সমর্থন করে লিখেছেন, 'ঘটনার দিক দিয়া কৃষ্ণকুমারী অত্যন্ত দীন। মধুসূদন ইহার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে মূল ঐতিহাসিক কাহিনীই বৈচিত্র্যহীন (Owing to the original barrenness of the plot) - (কৃষ্ণকুমারীর বিষয়বস্তু একটি উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রেরণা দান করিতে পারে, কিন্তু নাট্যিক উপকরণ হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইবার যোগ্য নহে।"[৯] কিন্তু ঘটনার দিক দিয়া 'কৃষ্ণকুমারী' মোটেই দীন নয়। টডের লিখিত কাহিনীতে ঘটনার কোনো অভাব নেই। জয়পুরাধিপতি ও মরুদেশের অধিগতির - প্রতিযোগিতা, মারাঠাসর্দারের সেই প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণ মানসিংহের নিজ রাজ্যে অন্তর্কলহ, ভিলেন আমীর খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, রাণাভীমসিংহের সঙ্কট, পরিশেষে

৮। J. Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan. Vol. I (London, 1957) Page 368-369.

৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য - 'বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড (১৯৬০) পৃঃ ১৮১

কৃষ্ণকুমারীর হত্যাবিষয়ে গোপনসভা এবং একাধিকবার বিষপান করিয়ে হত্যাসাধন প্রভৃতি কত বিভিন্ন ও বিচিত্র ঘটনায় কাহিনী চঞ্চল ও রোমাঞ্চকর। প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটকের সব উপাদানেই মূল আখ্যানবস্তু পরিপূর্ণ। টড যথার্থই বলেছেন ঃ "Thus finished the under plot, but another and more noble victim was demanded before discomfited ambition could repose, or the curtain drop on this eventful drama" [10]

এরূপ মন্তব্যের চেয়ে সার্থক মন্তব্য 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনী সম্পর্কে আর হতে পারে না। ডঃ বৈদ্যনাথ শীল 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছেন, "টড সাহেবের লিখিত কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহাসিকতা অক্ষুন্ন রাখিয়া নাটকখানি রচিত হইলে অতিউৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি রচিত হইতে পারিত।"[১১] মধুসূদন মূল কাহিনীর ঘটনানিচয়ের নাট্যরূপায়নে সার্থক হতে পারেননি তার বাহ্যিক ও আনুষঙ্গিক দ্বিবিধ কারণই নির্ণয় করা যেতে পারে। বাহ্যিক কারণ হচ্ছে মধুসূদন নাটক রচনা করতেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করানোর জন্য তাকে ডেস্কের ভিতরে পচিয়ে রাখবার জন্য নয়। কৃষ্ণকুমারীও তিনি অভিনয়ের জন্যই রচনা করেছিলেন এবং অভিনয়ের নানান বাস্তব সুবিধা অসুবিধার কথাও তাকে ভাবতে হয়েছিল। একটি পত্রে তিনি বলেছেন – 'What a romantic Tragedy it will make !.I have made the list of Dramatis personae as short as I could, for I wish to leave no loop hole for our manager to escape through..... but I shall make the tragedy as short as I can.'

(মধুসূদন রচনাবলী ,হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ পৃঃ ৩১৫)। এই কারণটি ছাড়াও আনুষঙ্গিক কারণ হচ্ছে , যে এই সময়ে মধুসূদনের কবিমন সম্পূর্ণভাবে নিমগ্নচিত্ত ছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য' বা তাঁর ভাষায় 'Heroic poetry' – রচনায়। কাজেই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনায় তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করতে পারেননি। বরং মেঘনাদবধের রসরূপ

১০। J.Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan.Vol.I(London,1957), Page- 367.

১১। বৈদ্যনাথ শীল,–'বাঙলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' (১৩৬৪) পৃঃ ১৩৫

দ্বারা 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভাবিতই হয়েছিল একারণে উভয় নাটকের মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। উভয় রচনার বিষয়বস্তুতেই পারিবারিক আকুলতা প্রাধান্য পেয়েছে, উভয়স্থানে নিয়তির প্রভাব দুর্বার। উভয়স্থলেই পিতার পাপও অক্ষমতা লাভ করে সমান। উভয়স্থলেই নিরুপায় পিতার মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি প্রদর্শিত হয়েছে। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে সংস্কৃত নাটকের কাব্যত্ব পরিহার করিবার সংকল্প প্রকাশ করলেও নাটকের উৎসর্গপত্রে কৃষ্ণকুমারীকে কাব্য বলেই নির্দেশিত করেছিলেন। আসলে মধুসূদনের প্রতিভা ছিল প্রথম শ্রেণীর কবির, গীতিকবির বললেও ভুল হয় না। নাটক বিশেষ করে, ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে হলে যে পরিমাণ নিরাসক্ত বস্তুচেতনার প্রয়োজন, মধুসূদনের প্রতিভাতে তার অভাব ছিল। মোহিতলাল মজুমদারের "মনুষ্য নাটকীয় প্রেরণা তাঁহার কবি প্রকৃতির অনুকূল ছিল না"।[১২] যথার্থ বলেই মনে হয়। কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কে ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন, 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ এই যে যেখানে কাহিনী ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সেখানেই ইহা নাটকোচিত গুনে সমৃদ্ধ হইয়াছে।'[১৩] আমরা এতোটা চরম মত প্রকাশ করি না। কৃষ্ণকুমারীর তথাকথিত ঐতিহাসিক অংশও নাট্যিক গুণে উৎকৃষ্ট তৎসত্ত্বেও মধুসূদন যে তাঁর নাটকে কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্রকে বেশ প্রাধান্য দিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শে ধনদাস মদনিকা বিলাসবতীর উপকাহিনীর অনেকটাই অপ্রয়োজনীয়। মধুসূদন যখন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন তখনও আমাদের দেশে ইতিহাস 'mass experience' - এ রূপান্তরিত হয় নি। ফলে কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস জীবনরূপ লাভ করেছে ঠিকই কিন্তু তাতে বর্ণবৈচিত্র্যের অভাব লক্ষিত হয়। আমরা নাটকে বিপর্যস্ত ভীমসিংহকে দেখি কিন্তু তাঁর বিপর্যয়ের কারণ প্রত্যক্ষ না করবার ফলে তাঁর চরিত্রের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল হতে পারি না। নাটকে কোথাও রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। রাণা ভীমসিংহের কালে রাজপুতেরা অনুর্কলহে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাদের শৌর্যবীর্য অলপই অবশিষ্ট ছিল তথাপি রাজোয়ারার কাহিনীতে অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই তা বর্ণহীন ঠেকে। রাজা জগৎসিংহ মদনিকাকে বলেছেন ঃ "সখি, এবড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে।" (৪র্থ অঙ্ক / ৩য় গর্ভাঙ্ক) এ উক্তি উক্তি মাত্রই। নাটকে তা প্রতিধ্বনিত

১২। মোহিতলাল মজুমদার, "কবি মধুসূদন" (১৩৫৪) পৃঃ ১৭

১৩। সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, "মধুসূদন, কবি ও নাট্যকার" (১৩৬৬) পৃঃ ১৪৩

হয় নি। হলে ঐতিহাসিক নাটকের প্রত্যাশিত বীররস সৃষ্টি হত। 'কৃষ্ণকুমারী'র ইতিহাস অংশ আরো প্রাণোত্তাপ লাভ করত। রচনারীতির দিক থেকে মার্লোর 'এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড'এর সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর মিল আছে। উভয় স্থলেই নাট্যকারেরা নিরাসক্ত চিত্তে অতীত ঘটনাকে যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে রূপায়িত করেছেন। মার্লোর লক্ষ্য ছিল 'এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড' চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা, মধুসূদনের ও লক্ষ্য ছিল ভীমসিংহ চরিত্রকে রূপায়িত করা।

বিলাসবতী, মদনিকা ও ধনদাস এই নাটকের প্রধান কাল্পনিক চরিত্র। বিলাসবতী চরিত্রটির আভাস মূল কাহিনীতে আছে। টডের গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডের 'Annal of Amber ' - এর তৃতীয় অধ্যায়ে জগৎসিংহের রক্ষিতার কথা বলা আছে। "Sometimes the daily journals (akbar)disseminated the - scandal of the rawula(female) appartments), the follies of the libertine prince with his concubine Ras -Caphoor,"[১৪]

.... "এই রসকর্পূরই নাটকে সক্তভাবে বিলাসবতীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।" মধুসূদন তাঁর পত্রে লিখেছেন : "This জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the 'Essence of Comphor'.. I think we may bring her in and allow her jealousy full play".

(মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ পৃঃ ৩১৬) নাট্যকার মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে রাজনীতিতে আবদ্ধ না রেখে তাকে মানবিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তুলবার জন্যই বিলাসবতীর চরিত্রকে আমদানী করেছেন। তাঁর স্বার্থেই মদনিকার চক্রান্ত, মানসিংহ কর্তৃক কৃষ্ণাকে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ। অনেকে মনে করেন শূদ্রকরচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বসন্তসেনার সাদৃশ্যে এই চরিত্রটি পরিকল্পিত হয়েছে। ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার দিক থেকে এইরূপ চরিত্র পরিকল্পনার সুযোগ আছে এবং এজন্য মধুসূদনকে প্রশংসাই করতে হয়। জগৎসিংহের দুর্বলতাকে তিনি কঠোর সমালোচনা না করে তাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখেছেন। বিলাসবতীর সঙ্গে সদয় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জগৎসিংহ আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন। অন্যদিকে বিলাসবতীর

১৪। J.Tod, <u>Annals and Ant</u>iquities of Rajasthan.
Vol.2 (London,1957), Page 303.

করুণমধুর মূর্তিও সুঅঙ্কিত হয়েছে। বিলাসবতী কেবলমাত্র বিলাস – সঙ্গিনী নয় সে প্রেম. প্রণয়ের যথার্থ প্রতিনিধিও বটে। মদনিকা ধনদাসকে যথার্থই বলেছে ঃ "ঐ দেখো – বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে ভাই আর পিরীতের কথার নামও করো না।" (৪র্থ অঙ্ক / ৩য় গর্ভাঙ্ক) মদনিকা আর ধনদাস সম্পূর্ণভাবে কল্পিত চরিত্র। ঐতিহাসিক নাটকে মদনিকার মতো অঘটন – ঘটন পটীয়সী চরিত্রের আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না। তবে কল্পনাপ্রাধান্য তার চরিত্রকে রোমান্সের চরিত্রে পরিণত করেছে। তাছাড়া যেভাবে অনায়াস নৈপুণ্যে সে সকলকে বোকা বানিয়েছে তাতে ঐতিহাসিক বাস্তবতা ক্ষুন্ন হয়েছে বলেই মনে করি। মানসিংহের কাছে কৃষ্ণকুমারীর নামে জালকরা পত্রপ্রেরণ এবং সেই জালপত্র পেয়ে মানসিংহ ভীমসিংহের নিকটে দূত পাঠানোর কল্পনা রুচিকর হয় নি। ধনদাস খলচরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত। এ ধরণের স্বভাবময় চরিত্র ও ঐতিহাসিক নাটকে জটিলতা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক। কিন্তু ধনদাস ঠিক টাইপ চরিত্রও হয় নি। নাটকের শেষে তার মনোভাবের পরিবর্তন কল্পিত হয়েছে। ফলে তার চরিত্রে কিছুটা অসঙ্গতি আছে তা স্বীকার করতেই হবে। বিলাসবতী মদনিকা ধনদাসের অনৈতিহাসিক উপাখ্যান 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ঐতিহাসিক মেজাজকে অনেকটাই নষ্ট করেছে তা অস্বীকার করা চলে না। প্রশ্ন হল, মধুসূদন কেন গৌণবিষয়কে এত প্রাধান্য দিলেন ? সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভাব অন্যতম কারণ তবেমূল কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। আমাদের মনে হয় মধুসূদন ধনদাস – মদনিকার প্রতিযোগিতার কাহিনীর নাট্যিক গতিকে গুরুত্ব দিলেও তিনি এই উপাখ্যানকে কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডির সঙ্গে সংযুক্ত করতেও সমর্থ হয়েছেন। ধনদাসের পরিণতির কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকার এই সত্যই উদঘাটিত করতে চেয়েছেন যে সম্পূর্ণ খলপ্রকৃতির হয়েও ভাগ্যদেবীর নিকট থেকে ধনদাস পরিণামে ক্ষমালাভ করেছে আর কৃষ্ণকুমারী সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও নিয়তির কাছ থেকে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্ত হয় নি। ধনদাসের উপকাহিনী এইভাবে নিয়তির নির্মমতাকে পরিস্ফুট করেছে বলেই কি নাট্যকার এই উপাখ্যানকে এতটা প্রাধান্য দিয়েছেন ?

ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে ভীমসিংহ, বলেন্দ্র সিংহ এবং কৃষ্ণকুমারী প্রধান। বলেন্দ্রসিংহের নামটি পরিবর্তিত হয়েছে। টড বর্ণনা করেছেন, 'The Maharaja Jowandas, a natural brother, was then called upon, the dire necessity was explained, and it was urged that no common hand could be armed for

the purpose. He accepted the poniard, but when in youthful loveliness kishna appeared before him,the dagger fell from his hand and he - returned more wretched than the victim."[15]

জোয়ানদাসই বলেন্দ্র সিংহে পরিবর্তিত হয়েছেন । পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বলেন্দ্র সিংহ টড বর্ণিত আচরণের অনুসরণ করেছেন ।তবে বলেন্দ্রসিংহের সামনেই কৃষ্ণা খড়্গাঘাতে মৃত্যুবরণ করেছেন, এই কলপনাটুকু মধুসূদনের নিজস্ব । তাছাড়া নাটকে কৃষ্ণ কুমারীকে হত্যা করবার পূর্বেই বলেন্দ্রসিংহের পরিচয় দেওয়া হয়েছে । তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই বলেন্দ্র সিংহকে প্রথম দেখা যায় । সেখানে বলেন্দ্রসিংহ লঘুচপল । সেখানে তিনি ধনদাসের ও মানসিংহের দূতের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করছেন । কিন্তু তারপরেই পঞ্চমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আমরা দায়িত্ববান, বিচক্ষণ ও ভ্রাতৃভক্ত বলেন্দ্র সিংহকে দেখতে পাই । কৃষ্ণার হত্যার ইঙ্গিতবহ অজ্ঞাতলেখকের পত্রের বৃত্তান্ত রাজা ভীমসিংহ শুনতে চাইলে তিনি বলেছেন ঃ "আজ্ঞা ,একথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্তে পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন ,"এখানে বলেন্দ্র সিংহের বিবেকের পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হই । এখানেই বলেন্দ্র সিংহের ভ্রাতৃ ভক্তিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় । তাঁর উক্তি 'মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত আছি ।"যথার্থই অনুগত ভ্রাতা ও দেশ প্রেমিকের উক্তি । পূর্বের হাস্যরসিক বলেন্দ্রসিংহের সঙ্গে এই বলেন্দ্রর প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই । করুণ বলেন্দ্রসিংহ একজন গোটা মানুষ । তাঁর মানবত্বের আরো পরিচয় নিহিত রয়েছে পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে । সেখানে মন্ত্রী বলেন্দ্রসিংহকে কঠিন কর্ম করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বলেছেন ঃ 'রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য মতা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না ।" তার উত্তরে মর্মপীড়ায় ক্ষুব্ধ বলেন্দ্র সিংহ জবাব দিয়েছেন ঃ 'আর ওসব কথায় আবশ্যক কি ? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি ,তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে ?" বলেন্দ্রসিংহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কিন্তু নিষ্ঠুর নন । 'আর ও সব কথায়, আবশ্যক কি ?' এর মধ্যেই তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রনার আভাস পাওয়া যায় । পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ঘটনার চরম মুহূর্তে বলেন্দ্রসিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁধ মানে নি । তিনি একাধিক স্বগতোক্তির মাধ্যমে নিজের অর্গল মুক্ত করে দিয়েছেন । তাঁর উভয়সঙ্কটের

১৫। J.Tod.,Annals and Antiquities of Rajasthan. Vol.1(London,1957), Page- 368.

বিষয়ও তিনি বিবৃত করেছেন। চিন্তা করে তিনি বলেছেন ঃ "তা কি করি ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ, (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার দেখছি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটল, কোনো দিকেই পরিত্রাণ নাই।' বলেন্দ্রসিংহ এতৎসত্ত্বেও প্রকৃত রাজপুতবীরের মতো কৃষ্ণাকে হত্যা করতে হস্ত উত্তোলন করেছেন কিন্তু কৃষ্ণাকে জাগতে দেখে তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারেনি, অসি ভূতলে নিক্ষেপ করে ফেলেছেন। পরে কৃষ্ণাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে তিনি রোদন করেছেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে একমাত্র বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রেই কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার সমন্বয় এবং তীব্র সক্রিয়তা পরিদৃষ্ট হয়। মধুসূদন খাঁটি কবি কল্পনার দ্বারা ইতিহাসের এই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই চরিত্রটিকে সমালোচনা করে বলেছেন ঃ "রাজা ভীমসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রটি সেক্সপীয়র রচিত 'King John'- নামক নাটকের ফিলিপ দি ব্যাস্টার্ড চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। বলেন্দ্রসিংহ ব্যক্তিত্ব হীন পুরুষ, কৃষ্ণকুমারীর হত্যাকে ভ্রাতার আদেশ বিবেচনা করিয়া বিনা দ্বিধায়ই এই জঘন্য কার্যে সে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তারপর কৃষ্ণকুমারীর নিকট যখন ধরা পড়িয়াছে, তখনও নিঃসঙ্কোচে এই কার্যে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে গিয়া এই ব্যাপারে তাহার ভ্রাতার নির্দেশরই উল্লেখ করিয়া দিয়াছে। একটু নির্বোধ সরলতা তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।"[১৬] কিন্তু বলেন্দ্র সিংহকে ব্যক্তিত্বহীন অথবা নির্বোধ বলা চলে না। ভীমসিংহ অপেক্ষা তাঁর ব্যক্তিত্ব অধিক বলে মনে হয় আর যেভাবে স্থিরবুদ্ধির দ্বারা তিনি কৃষ্ণার হত্যার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন এবং দাদার পায়ে পড়ে প্রতিজ্ঞা করে এ কর্মে অগ্রসর হয়েছেন তা থেকে তাঁর নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ হয় না। কৃষ্ণা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, 'কাকা আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা যে —' তখন তার উত্তরে বলেন্দ্র সিংহ বলেন্দ্রসিংহ বলেছিলেন, 'মা, আমি আর কি বলবো ? তাঁর অনুগতি ভিন্ন আমি কি, এমন চণ্ডালের কর্ম কত্তে প্রবৃত্ত হই ?' (৫ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) এখানে বলেন্দ্র সিংহ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাফাই গিয়েছিন বলে মনে হয় না। কৃষ্ণকুমারী পিতার ইচ্ছার কথা জিজ্ঞেস করার পরেই বলেন্দ্রসিংহ সত্যকথা বলেছেন যে এতে তাঁর দাদার অনুমতি আছে। যদি তিনি সাফাইই গাইতেন তাহলে প্রথমেই এটি বলতে চাইতেন। কিন্তু প্রথমে তিনি বলেছেন 'কৃষ্ণা আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তে এসেছিলাম'। (৫ম অঙ্ক/ ২য় গর্ভাঙ্ক)

১৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৬০) প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭

ভীমসিংহ এবং কৃষ্ণকুমারী এই দুইটি প্রধান খাঁটি ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু ইতিহাসে অর্থাৎ টডের রাজস্থানে এঁদের বিশদ বিবরণ নেই। ঘটনাজালের বর্ণনা থেকে মধুসূদনকে প্রায় সবটাই নিজেকে গড়ে নিতে হয়েছে। এবং এই নির্মাণ কর্মে মধুসূদন ঐতিহাসিক ভাবসত্যের বিরোধী কোনো কিছু কল্পনা করেননি। প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে কৃষ্ণকুমারী এবং ভীমসিংহ গৃহীত হবার যোগ্য। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রে জটিলতা তেমন নেই। সে সরলতার প্রতিমূর্তি। নিয়তির নিষ্ঠুরতাকে তীব্র করবার জন্যই যেন তাকে একটী সরলাবালা করা হয়েছে। নাটকের শেষের দিকে তার চরিত্রে আদর্শের প্রভাব আছে। পদ্মিনীর প্রত্যাদেশ একটা মহৎ প্রেরণার সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রে কোনো বিকাশ নেই একথা একেবারে ঠিক নয়। প্রথমে সে ছিল একেবারেই প্রকৃতি, সঙ্গীত, এবং পুষ্পের জগতের অধিবাসী। বাইরের জগতের সে কিছুই জানত না। কিন্তু ক্রমে মদনদেবের পুষ্পশর তাকে আঘাত করল। তখন সে কুটিল রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন হল। মদনিকাকে পরিহাস করে সে বলেছে ঃ 'দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি, কে জেতেন।' (দ্বিতীয়াঙ্ক/তৃতীয় গর্ভাঙ্ক) যে কৃষ্ণকুমারী সুখের ক্ষুদ্র জগতে বাস করত সে ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর অভিজ্ঞতার প্রসারিত পরিধিতে এসে পড়ল। যে কৃষ্ণকুমারী ফুল, গান নিয়ে ব্যাপৃত থাকত সে এখন পরিবর্তিত হয়েছে। নিজেই সে বলেছে, "আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়। আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম?" (৩য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক) পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মৃত্যুবরণের পূর্বে কৃষ্ণকুমারী প্রকৃত বীরকন্যার মত বলেছে ঃ 'কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে! আপনি বীরকেশরী আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি" (৫ম অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক)। এই ভাবে সরলা রাজকুমারী ক্রমে ক্রমে প্রণয়, রাজনীতি ও কঠিন নিয়তির সংস্পর্শে এসে বিকশিত হয়েছে। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রাঙ্কনে ত্রুটি হচ্ছে যে এই চরিত্রে নাট্যকার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটাতে পারতেন, কিন্তু সে সুযোগের তিনি সদব্যবহার করেননি।

ভীমসিংহকে নাট্যকার দুর্বল চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। নাটকে ভীমসিংহের পিতৃরূপেই প্রাধান্য পেয়েছে। *টড/রাণা/হিসাবের/ভীমসিংহের/পিতৃরূপেই/প্রাধান্য/পেয়েছে।* টড রাণা হিসাবে ভীমসিংহের নানা সংগ্রাম মুখর যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন মধুসূদন তা গ্রহণ করেননি। সংগ্রাম পর্যুদস্ত ভীম সিংহকেই আমরা নাটকে দেখি। রাণী অহল্যাদেবী তপস্বিনীকে যথার্থই বলেছেন, "ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা

করে না ?" (২য় অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক) কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জনই যখন নাটকের মূল বিষয় তখন ভীমসিংহের বীরত্ব প্রদর্শন না দেখিয়ে নাট্যকার নাটকের ভাবৈক্য রক্ষা করেছেন । তাতে চরিত্রটি ইতিহাসবিরোধী হয় নি । উক্ত উল্লেখিত রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া ভীমসিংহ চরিত্রে প্রথমাবধিই দেখানো হয়েছে । তিনি তপস্বিনীর কাছে আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজরক্ষা কত্যে হলো ? ধিক আমাকে ? এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে ?" (২য় অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক)। ভীমসিংহের রাজনৈতিক কার্য্যাবলী 'রাজস্থানে' যেমন বর্ণিত আছে মধুসূদন নাটকে তারই অনুসরণ করেছেন । উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেননি । ভীমসিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটিই নাট্যকারের নিজস্ব ক্ষেত্র । মধুসূদন ভীমসিংহ চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাবেশ ঘটিয়ে তাঁর যন্ত্রনা যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । জগৎসিংহের প্রস্তাব নিয়ে দূত উদয়পুরে এলে ভীমসিংহ যখন আসন্ন কন্যাবিদায়ের বেদনায় অধীর সেই সময়েই নিয়তির পরিহাসরূপে মানসিংহের দূতও একই প্রস্তাব নিয়ে এলে রাণা স্বগতোক্তি করে বলেছেন, "রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন ?" (২য় অঙ্ক / ৩য় গর্ভাঙ্ক)। তিনি যে পত্নী ও কন্যার কাছে বসে ভালো করে নিজের মনের কথা বলবেন সে অবকাশ ও পাননি । মানসিংহ ও জগৎ সিংহের প্রতিযোগিতার ফলে ভীমসিংহের অবস্থা হয় দুর্বিষহ । তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠেন , 'ভগবতি এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে !' (৩য় অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) । শুধু তাই নয় তিনি মর্মজ্বালা সইতে না পেরে সাধারণ লোকের মতই কন্যাকে অভিযুক্ত করেন, "আমার এমন , অমূল্য রত্নটি ও কি অনলহয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো !" (ঐ) এরূপ আক্ষেপ রাজোচিত হয় নি বটে কিন্তু তা অস্বাভাবিক বলা যায় না । রাণা ভীম সিংহের অসহায় অবস্থা এই উক্তির মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর কিছু করবার নেই কেবল মুখবুজে সমস্ত কিছু সহ্য করতে হবে । কিন্তু সহ্যের ও সীমা আছে । মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ উক্তি বের হয়ে আসে, "হায়, এশৈল রাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্ম গ্রহণ করেছে ?" (৫ম অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক) । কন্যাকে তিনি দোষী করেছেন বটে কিন্তু তার মধ্য দিয়ে নিজের অক্ষমতাই প্রকাশ হয়ে পড়ে । তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য, "দেখ, মন্ত্রি, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখচি রোগ নিরাকরণ কত্যে সুনিপুণ ।" (ঐ) অপ্রিয় উক্তি ভীমসিংহের পক্ষে এরূপ উক্তি অমর্যাদাকর ও বটে তবু এর ভিতর দিয়ে ভীমসিংহের আভিজাত্য, দর্প, অহমিকা সব ভেদ করে যেভাবে মানুষের চেহারা বেরিয়ে পড়েছে তা অন্যথায় সম্ভবপর হত না । ভীমসিংহ বলেন্দ্রসিংহের

মত দৃঢ়চেতা নন, তাই তিনি শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছেন। তাঁর পূর্বাপর দুর্বলতার সঙ্গে এরূপ পরিণতির সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। তিনি কন্যাকে হারিয়ে রাজ্যকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। তাঁর ট্র্যাজেডি এইখানে। ভীমসিংহ চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার আত্মিক ক্ষয় এবং নিরুপায়তার বেদনা অভিব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। পরবর্তীকালে এই চরিত্রটি প্রসারিত হয়ে দেখা দেয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'নুরজাহান' চরিত্রে। নুরজাহানও স্নেহের - বিনিময়ে ক্ষমতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, রেখেও ছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ভীমসিংহ চরিত্রটি মধুসূদনের উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি, এ সত্য স্বীকার করতেই হবে।

ভীমসিংহ ছাড়া রানী অহল্যাদেবী এবং জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র। তবে তাঁরা গৌণ চরিত্র। তাঁদের চরিত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য - সংযোজিত হয়নি। আবার ঐতিহাসিক সত্যও লঙ্ঘন করা হয়নি।

ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিরূপে 'কৃষ্ণকুমারী' মোটামুটি উত্তীর্ণ। শেকসপীয়রের Mingle Drama এর আঙ্গিকেই নাটকটির গঠন পরিকল্পিত। কমিক ও ট্র্যাজিক উভয়বিধ উপাদানই নাটকে গৃহীত হয়েছে। নাটকের শুরু হয়েছে লঘুভাবে। প্রথম অঙ্কে ট্র্যাজেডির বিষাদ বিপদের বিন্দুমাত্র আভাস নেই। বরং দ্বিতীয় ও গর্ভাঙ্কের শেষে মদনিকা যখন বলেছে ঃ 'ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর দুটি নেই, কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে"। তখন প্রহসনোপযোগী মজার পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করবার জন্যই আমাদের মন প্রাণ উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে এসেই আমরা অন্য এক সমস্যা ভারাক্রান্ত জগতে এসে প্রবেশ করি। অহল্যাদেবীর প্রথম - সংলাপেই আমরা ক্রমে ক্রমে এক বিষাদরাজ্যে এসে প্রবেশ করি। আবার দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই মদনিকা ,ধনদাসের মজাদার কার্যকলাপ। এইভাবে কৌতুক এবং করুণ রস নাটকে পরস্পর মিশ্রিত হয়ে আছে। শুধু পঞ্চম অঙ্কটিই গম্ভীর ,হাস্যরসবিহীন। শেকসপীয়র তাঁর ট্র্যাজিডি গুলিতে যেভাবে কমিক ও ট্র্যাজিক উপাদান মিলিয়ে সংহত রসসৃষ্টি করেছেন মধুসূদন তা লক্ষ্য করে একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন,

"The most beautiful Plays in the world are combination of Tragedy and comedy".

(মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃঃ ৩১৮)। কিন্তু মধুসূদন ই ইউরোপীয় নাটকের শিল্প সৌষ্ঠব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারেননি। তথাপি তাঁর নাট্যিক সংস্কার সহজভাবেই এ সত্য বুঝতে পেরেছিল যে গ্রীকট্র্যাজেডির সংহত আকার

নয় শেকসপীয়রের রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শই বাঙলা ট্র্যাজেডির পক্ষে অনুসরণ যোগ্য। মধুসূদন গ্রীক ট্র্যাজেডির জীবনসত্যকে গ্রহণ করেছিলেন, গঠনশিল্পকে নয়। নিয়তির নির্মম বিধান মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কিভাবে তছনছ করে ফেলে গ্রীক ট্র্যাজেডির এই জীবন সত্যই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মূলভাব। ভীমসিংহের উন্মাদ হয়ে যাওয়া, রানীর মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা কিছুটা অতিনাটকীয় হলেও সেগুলি উক্ত মূলভাবের পোষকতা করেছে বলেই সার্থক।

শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টিতেও মধুসূদন এ নাটকে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রানী অহল্যাদেবী কন্যার বিয়ের কথা ভেবে হঠাৎ বলে উঠেছেন ঃ "তোমার পূর্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনী দেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হলে?" এই উক্তিটি ড্রামাটিক-আয়রণি এবং কৃষ্ণকুমারীর পরিণতির ইঙ্গিতবাহী বলে তাৎপর্যপূর্ণ। ভাবগতবিচারে পদ্মিনীর ছায়ামূর্তি দর্শন এবং আকাশবানী শ্রবণ নাটকের করুণরসের বিরোধী কিন্তু অলৌকিকতা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এখানে নবতর সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে যা সূক্ষ্মভাবে নাট্যকারের শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে। পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যদিয়ে আভাসিত হয়েছে। তাছাড়া একলিঙ্গের মন্দির, ভৃত্যের ভয়াকুলতা, রক্ষকের সন্ত্রস্ততা, বলেন্দ্র সিংহের দ্বিধা, চারিজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব, তাঁদের 'হর হর হর। ব্যোম ব্যোম ব্যোম' উচ্চারণ, বলেন্দ্রসিংহের অশ্বযোগে যাত্রা, ভীমসিংহের মানসিক চাঞ্চল্য চলচ্চিত্রের মত দ্রুত কিন্তু অব্যর্থ আবেদন সৃষ্টি করে। একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে, তাই সকলেই সঙ্কাকুল, এমনকি প্রকৃতিও ক্রুদ্ধ। শেষ দৃশ্যটির প্রথমেই রাণী কৃষ্ণাকে ব্যাকুলভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তখনও তিনি প্রকৃত বিষয় অনুমান করতে পারেননি। কিন্তু স্বপ্নই তাঁকে সজাগ করে দিয়েছে। ওদিকে শয়নগৃহে প্রবেশ করে কৃষ্ণা অন্ধকার রাত্রিকে দেখে ভয় পেয়ে উঠেছে। তার ঘুম আসতে চায় না অবশেষে যখন এলো তখন বলেন্দ্রসিংহের অস্ত্রের আস্ফালনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, । সে চমকে জেগে উঠল। এইভাবে, রানীর স্বপ্ন, কৃষ্ণার নিদ্রা, নিদ্রা থেকে জাগরণ, সুন্দর তাৎপর্যের সূত্রে বিধৃত হয়েছে।

নবজাগ্রত ভারতবোধ তথা দেশাত্মবোধের আভাসও কৃষ্ণকুমারী নাটকে সুপ্ত আছে। ভীমসিংহ উদয়পুর, মেবার বা হিন্দুস্থান না বলে একাধিকবার ভারত ভূমির উল্লেখ করেছেন এবং অতীতকালের গৌরবের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই ভীমসিংহ আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে, 'ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে?

এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলে আমরা যে মনুষ্য কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না'। তারপরেই ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষাঃ 'ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখন অব্যাহতি পাবো ? তপস্বিনী ও যথারীতি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন ঃ "মহারাজ ভারতভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮ – ১৯২৫) ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', ~~[illegible]~~, 'অশ্রুমতী' এবং 'স্বপ্নময়ী' এই চারটি নাটক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করে রচিত হয়। সুলিখিত, প্রামাণিক এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে তিনি লেখেন 'পুরুবিক্রম'। ভারত ইতিহাসের মুষ্টিমেয় হিন্দুবীর নৃপতিদের মধ্যে পুরুর স্থান অবিসংবাদিত। পুরুর স্বাধীনতা স্পৃহা এবং আত্মমর্যাদা আদর্শস্থানীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাই সঙ্গতভাবেই পুরুর বিক্রম নিয়ে দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় অগ্রসর হয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশাত্মবোধক নাটক হিসাবে 'পুরুবিক্রম' মোটামুটি সফল হলেও ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে এটি উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তাঁর কারণ যেরূপ বস্তুধর্মী (objective) কল্পনা থাকলে ভালো ঐতিহাসিক নাটক রচনা করা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তার অভাবই ছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত করবার মানসেই ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী নিয়ে তিনি 'পুরুবিক্রম' নাটক রচনা করেন[১৭]। এই স্বদেশপ্রীতির ভাবাকুলতা তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পুরু বিক্রমের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ও তিনি নানা ভাবে পরিবর্তন করেছেন। রাজস্থানের কাহিনী বা বর্দ্ধমান অঞ্চলের ক্ষুদ্রবৃত্তান্তের মধ্যে কল্পনার অনুপ্রবেশ ততো গুরুতর নয় কিন্তু সুবিদিত আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কাহিনী বর্ণনায় নাট্যকারের সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। তিনি 'অশ্রুমতী' প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন "... নাটক ও ইতিহাস এক জিনিস নহে। কোনো দেশের কোনো নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত হয় না।[১৮]" তা সমীচীন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইতিহাসের

১৭। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি" (১৩২৬) পৃ ১৪১ দ্রষ্টব্য
১৮। সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) পৃঃ ২১৬

বস্তুগত সত্যকে যথাসম্ভব অবিকৃত না রাখলে ইতিহাস আর কল্পনায় পার্থক্য থাকে কোথায় ? জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কল্পনার অতিরেক তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের বাস্তবসত্য এবং মর্মসত্যকে নানাভাবে ক্ষুন্ন করেছে তা স্বীকার করতেই হবে। আলোচক যথার্থই বলেছেন, "কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ তাঁহার মানস ইচ্ছা ও আদর্শ অনুযায়ী ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন।"[১৯] 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪)। খৃঃ পূর্ব ৩২৭ অব্দে বিখ্যাত গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি সর্বত্রই বিজয়ীর মত অভ্যর্থিত হন, শুধু পাঞ্জাব প্রদেশের ঝিলাম এবং চেনাব নদীর মধ্যস্থ পুরু তাঁকে সসৈন্যে বাধা দেন। আলেকজাণ্ডার তক্ষশীলা থেকে পুরুর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলে পুরুতা দর্পভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ৩০,০০০ পদাতিক, ৪০০০ অশ্বারোহী ৩০০ রথ এবং দুইশ বলবান রণহস্তী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের বিরাট সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং শেষে পরাজিত হয়ে বন্দী হন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুক্তি দেন এবং তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন। ইতিহাসে পুরু সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'Poros, a giant ~~against~~ six and a half feet in height, fought to the last, and received nine wounds before he was taken prisoner."[20] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ঐতিহাসিক মূল ঘটনাগুলি অবিকৃত রেখেছেন। তক্ষশীলরাজ নবাভিষিক্ত আম্ভী কে নাটকে তক্ষশীল বলা হয়েছে। তাঁর কাছে আলেকজাণ্ডারের দূত প্রেরণ, তক্ষশীলের ঈর্ষ্যাপ্রসূত পুরুর বিরুদ্ধাচরণ এবং আলেকজাণ্ডারের পক্ষ গ্রহণ, পুরু কর্তৃক স্বাধীনতা রক্ষাকারী রাজাদের নেতৃত্বদান, পুরু ও আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ, পুরুর পরাজয়বরণ, বন্দী হওয়া এবং পরিশেষে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক মুক্তি দান এ সকল ঘটনা ইতিহাস অনুমোদিত। তবে আলেক-জাণ্ডার ও পুরুর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরিকল্পনা নাট্যকারের নিজস্ব। নাটকীয় উৎকণ্ঠা জাগিয়ে পরিস্থিতিকে জমিয়ে তুলবার জন্য এরূপ একটু আধটু পরিবর্তন মোটেই নিন্দনীয় নয়। কিন্তু নাট্যকার এখানেই থেমে থাকেন নি তিনি আরো এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়ে বর্ণনা করেছেন যে 'পুরু সবলে সেকেন্দর শা'র গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসিবিদ্ধ করিতে উদ্যত।' এখানেই ব্যাপারটি শেষ হয়নি। আরো রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির

১৯। অজিতকুমার ঘোষ—"বাংলা নাটকের ইতিহাস" (১৯৬৬) পৃঃ ১৩৯

২০। V.A.Smith, The Oxford History of India(Oxford,1920),Page-63.

উদ্ভাবন করা হয়েছে। আলেকজাণ্ডারকে বিপন্ন দেখে একজন গ্রীক সেনা দৌড়ে এসে পুরুকে অসির দ্বারা আহত করল। পুরু আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন সেকেন্দর শা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই সৈনিকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। পুরুর সৈন্যগণ ক্রোধে অসি নিষ্কোষিত করে যবনরাজকে অসির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেলবার জন্য এগিয়ে এলো। পুরু তাদের নিরস্ত্র করে বললেন, "সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, ক্ষত্রিয়ের এরূপ নিয়ম নয় যে, কথা দিয়ে আবার তার বিপরীতাচরণ করে। আমি কথা দিয়েছি, আমার সৈন্যগণ আমাকে সাহায্য করবে না, অতএব তোমরা নিরস্ত্র হও" (৩য় অঙ্ক ৷১ম গর্ভাঙ্ক) তখন আলেকজাণ্ডার লজ্জিত হয়ে প্রস্থান করলেন। পুরুর বিক্রম এবং মহানুভবতা প্রদর্শন করাবার জন্য নাট্যকার যেভাবে ইতিহাস বিশ্রুত দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের বীরত্ব ধূলিসাৎ করেছেন তা ইতিহাস বিরোধী তো বটেই নাট্যকারের স্বাভাবিক বাস্তবতাজ্ঞানেরও অভাব সূচিত করে। পুরুকর্তৃক আলেকজাণ্ডারের গ্রীবাদেশ ধারণ ঐতিহাসিক-বিচ্যুতির চরমসীমা বললেও অত্যুক্তি হয় না। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আলেকজাণ্ডার ও বন্দী পুরুর সাক্ষাৎকারের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে। যখন আলেকজাণ্ডার পুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি পুরু! তোমার দর্প এখনও চূর্ণ হয় নি? এখনও তুমি নত হলে না? এখনও তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন কচ্ছে সাহস কচ্ছ? এখন মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন তুমি আমার কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা কত্তে পার?" তার উত্তরে পুরু বলেন "তোমার কাছ থেকে আমি অন্য কিছুই প্রত্যাশা করি নে।" তখন সেকেন্দর বললেন, "তোমার এখন শেষ দশা উপস্থিত, এখন তোমার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করা - কিরূপ মৃত্যু তোমার অভিপ্রেত? এই অন্তিম কালে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কত্তে হবে বলো?" প্রত্যুত্তরে পুরু সেই বিখ্যাত উক্তি করলেন, "এই ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেইরূপ মৃত্যু ও রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কত্তে হয়, সেইরূপ ব্যবহার।" (৫ম অঙ্ক ৷২য় গর্ভাঙ্ক) এর পর আলেকজাণ্ডার মহানুভবতা প্রদর্শনকরে পুরুকে মুক্তি দিয়ে এবং তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে অধিকন্তু যখন বলেন, - "লৌহশৃঙ্খল হতে তুমি এখন মুক্ত হলে - এখন রাজকুমারী ঐলবিলার সহিত প্রেম - শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে দুজনে সুখে রাজত্ব ভোগ করো, এই একমাত্র কঠিন দণ্ড তোমাকে প্রদান করলেম"। (৫ম অঙ্ক ৷২য় গর্ভাঙ্ক) তখন তা ঐতিহাসিক কল্পনার অনুপযোগী হয়েছে বলেই মনে করি, কারণ, "আমি স্বীকার কচ্ছি, তোমার উপর আমি যে জয়লাভ করেছিলাম, তাহা বাস্তবিক জয় নয়। তোমার রাজ্য তুমি ফিরে লও, আমি তা চাই নে।" আলেকজাণ্ডারের মুখে এই উক্তি শুনতেই আমরা অভ্যস্ত।

তারপরেই ঐলবিলার প্রসঙ্গ এবং নূতন দণ্ড আমাদের ইতিহাসবোধকে আঘাত করে বইকি। অন্য সময়ে অন্য প্রসঙ্গে এরূপ উক্তি আলেকজাণ্ডারের মুখে শোভন হত। নাটকের প্রথমেই পুরুর মুখে নাট্যকার একটি উক্তি দিয়েছেন যা উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করি। পুরু সেখানে তক্ষশীলকে বলেছেন, আপনি যেরূপ শান্তির জন্য উৎসুক হয়েছেন, আমি তেমনি যুদ্ধের জন্য লালায়িত। সেকন্দর শাকে আমার বিক্রমের পরিচয় দেবার জন্যই আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। যেদিন অবধি আমি তাঁর কীর্তিকলাপ শ্রবণ করেছি, সেইদিন থেকেই এই বাসনাটি আমার মনেচিরজাগরূপক রয়েছে যে, তিনি যেন একবার ভারতভূমে পদার্পণ করেন। সেইদিন অবধি আমার মন তাঁকে চিরশত্রু বলে বরণ করেছে। এদেশে আসতে তাঁর যত বিলম্ব হচ্ছিল আমার মন ততই অধীর হয়ে উঠছিল, তিনি যখন পারস্য দেশ জয় করে এলেন, তখন আমার এই ইচ্ছা হচ্ছিল যে, যদি আমি পারস্যের রাজা হতেম, তাহলে আমার কি সৌভাগ্য হত। আমি তাহলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার অবসর পেতেম।' (১ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক)। এখানে দেখা যাচ্ছে যে নাট্যকার পরিকল্পিত দেশপ্রেমিক পুরুর ধারণাটি সা সমুলে ধাক্কা খেয়েছে। দেশরক্ষা নয়, নিজের বিক্রমের পরিচয় দেওয়াটাই বড়। দিগ্বিজয়ী বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে খ্যাতি অর্জন করবার ক্ষুদ্র স্বার্থই পুরুর যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার মূলে, ক্ষত্রিয়কুলের মানরক্ষা দেশোদ্ধার এ সমস্তই হচ্ছে গৌণ। পুরু কর্তৃক তক্ষশীলের প্রাণনাশ করার ঘটনাও নাট্য-কারের উদ্ভাবিত তা ঐতিহাসিক নয়।

অনৈতিহাসিক বিষয়বস্তু তো বটেই অনৈতিহাসিক ভাবের আমদানীও পুরু বিক্রম নাটকের রসসৃষ্টিকে নানাভাবে ব্যাহত করেছে। এ নাটকে দেশপ্রেম এবং প্রণয় দুইয়েরই আধিক্য পীড়াদায়ক। ডঃ সুশীল রায় বলেছেন, 'নাটকে প্রেমগীতি ও প্রেম প্রণয়ের সংঘাত আবশ্যক তা এখানে আছে। কিন্তু নরনারীর প্রেমকেই মুখ্য করা হয়নি, সে প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, অথচ সেই প্রেমের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা দিয়ে নাটকের কাহিনী রমনীয় করা হয়েছে।[২১] কিন্তু নাটকটিকে এ সত্ত্বেও প্রেমপ্রণয়ের বা বিরহমিলনের ঘাত প্রতিঘাতের উপর নির্ভরশীল রাখা হয় নি' একথা সত্য নয়, এ নাটকের প্রধান ঘটনা ও তার পরিণাম সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে পুরু এবং ঐলবিলার প্রণয়সঞ্চারের মধ্যে। পুরু এবং সমস্ত রাজকুমারগণের যুদ্ধের প্রধান প্রেরণা, ঐলবিলার প্রণয়। নাটকের প্রথমেই ঐলবিলা বলেছেন, 'আমি তাঁদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা

২১। সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) পৃঃ ১৪৩

করেছি যে, যে রাজকুমার যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন , আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।" এবং "আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি , তাতে আমার আনুরিক প্রেমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না, অথচ এতে সমস্ত রাজকুমারগণ উৎসাহিত হয়ে, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন" (১ম অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক) তাহলে দেখা যাচ্ছে এলবিলা দেশপ্রেম নয় প্রণয় লোভ দেখিয়ে রাজকুমারদের একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয় পুরুর প্রতি তাঁর আনুরিক প্রেমের কোনো ব্যাঘাত হবে না জেনেই তিনি একাজে অগ্রসর হয়েছেন। যদি ব্যাঘাত হত তাহলেও যদি তিনি অগ্রসর হতেন ,তবেই না তাঁর দেশপ্রেমের যথার্থ পরীক্ষা হত। সে সম্বন্ধে তিনি নীরব বলেই তাঁর দেশ প্রেমের আনুরিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। তক্ষশীল যে পুরুর পক্ষে যোগদান করেননি তার কারণও দেখানো হয়েছে এলবিলার প্রেমের প্রতি তক্ষশীলের সন্দেহ এবং এলবিলার প্রেমিক পুরুর প্রতি তক্ষশীলের ঈর্ষা। তক্ষশীল প্রথমে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সন্ধি করতে চান নি কিন্তু অম্বালিকার দ্বারা প্ররোচিত হয়েই এবং পুরুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। দেশপ্রেম যদি নাটকের প্রধান ভাব হত তাহলে বন্দী পুরুর এলবিলার প্রতি সন্দেহ, এলবিলাকে তক্ষশীলের বন্দীকরণ, অম্বালিকার অনুতাপ এবং পরিশেষে পুরু, এলবিলার মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকাপাত হত না। আলেক-জাণ্ডার কর্তৃক পুরুকে মুক্তিদানের পরেও নাটকের পরিণাম প্রলম্বিত হয়েছে কারণ পুরুর রাজনৈতিক মুক্তিই শুধু নয় তাকে প্রণয়যন্ত্রণা থেকেও মুক্তিদান নাট্যকারের একান্ত অভিপ্রেত। পুরুর প্রণয়কে অনৈতিহাসিক বলেছি একারণেই যে ইতিহাসে আছে পুরুর একাধিক বয়স্ক পুত্র ছিল, তাঁরা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন।"[২২] এ হেন হিন্দুরাজা পুরুর পক্ষে কুলুপর্বতের রানীর সঙ্গে প্রণয় কতোটা স্বাভাবিক তা সহজেই চিন্তনীয়। প্রণয় চিরন্তন বৃত্তি হলেও তা দেশকালপাত্রের নিয়মাধীন। বহুপত্নীক পুরুর উপরে যে রোমান্টিক প্রণয়ীর সত্তা আরোপ করা হয়েছে তা কালাতিক্রমন দোষে দুষ্ট। তেমনি অস্বাভাবিক অম্বালিকার দুর্বার প্রেম। বিদেশী, বিধর্মী আলেকজাণ্ডার অন্তঃপুর থেকে অম্বালিকাকে চুরি করে নিয়ে গেলেন কিভাবে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন নাই করলাম কিন্তু কিভাবে তিনি আবার প্রাসাদে স্থান পেলেন সেটাই বেশী আশ্চর্য। নারী ধর্মে পতিত হয়েও সমাজ সংস্কারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি দিব্যি প্রেমিকার অভিনয় করে গিয়েছেন। নির্লজ্জের মত দাদার সঙ্গে প্রেমপ্রসঙ্গ ও

২২। 'The Indian losses were enormaus, and included two sons of Porus' The Cambridge Shorter History of India .(Cambridge,1934)-Page-25.

আলোচনা করেছেন । আলোচক বলেছেন, 'পুরু — এলবিলা কিংবা অম্বালিকা সেকেন্দর শার প্রেম কাহিনী ইতিহাসে নেই । কিন্তু মুল ইতিহাসের বোধকে অক্ষুন্ন রেখে নাট্য — কারের কাহিনী বিস্তারের ক্ষমতা আছে । সুতরাং এসব কাহিনী বা চরিত্রের সৃষ্টির জন্য তাঁর নাটকের ঐতিহাসিক মুল্য কিছু কমে নি'।[২৩] পুরু — এলবিলা এবং অম্বালিকা — সেকেন্দর শার প্রেমকাহিনীতে যে ঐতিহাসবোধ অক্ষুন্ন থাকে নি, এবং সেজন্যই পুরু — বিক্রমের ঐতিহাসিক মুল্যও কমেছে আমরা এতক্ষণ সেইটাই আলোচনা করে দেখালাম । এ প্রসঙ্গে ডঃ বৈদ্যনাথ শীলের মন্তব্য উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না । তাঁর মন্তব্য "আরো আশ্চর্য, সেই লাঞ্ছিতা, অপহৃতা ভগিনী যখন ম্লেচ্ছ — শিবির হইতে ফিরিল, তক্ষশীলার রাজ অন্তঃপুরে সেই কুলকন্যাকে মাল্য ভুষিত করিয়া শঙ্খ বাজাইয়া বরণ — করিয়া লইল । প্রাচীন হিন্দু রাজ — অন্তঃপুরের মর্যাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কি করিয়া ভুলিয়া গেলেন ?"[২৪] এ দৃষ্টি ভঙ্গি রক্ষণশীল এবং সাহিত্য বিচারে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে । কিন্তু সাহিত্যকেও দেশকালপাত্রের নিয়ম মেনেই রসসৃষ্টি করতে হয়। ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে একথা আরো অধিক সত্য ।

বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের সাধারণ অশ্লীলতাদোষদুষ্ট সাহিত্যিক পরিবেশের পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করে নাটকের বীররস ও মার্জিত রুচির প্রশংসা করেছিলেন । কিন্তু একালের বিচারে দেখা যায় নাটকের বীররস স্থূল এবং তা অনেকটাই বাকসর্বস্ব । পুরুর বক্তৃতা, সৈন্যগণের মন্ত্রউচ্চারণ, "মরণশরণ কিম্বা যবননিধন

যবননিধন কিম্বা মরণশরণ,

শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন ।"

কথামাত্র । এর পিছনে যথেষ্ট উত্তাপ বা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা নেই । তাছাড়া সেকন্দর শা ও পুরুরাজের দ্বৈরথ সমর, পুরুর অসির আঘাতে সেকন্দর শার অসি হস্ত থেকে সখলিত হওয়া, সেকেন্দর শার অস্ত্রাঘাতে পুরুরাজের অসির অগ্রভাগ ভগ্ন হয়ে যাওয়া, পুরু কর্তৃক সেকন্দর শার গ্রীবাদেশ ধারণ করে তাঁর বক্ষে অস্ত্র বিদ্ধ করা, সেকন্দরের একজন সেনার দৌড়ে এসে পুরুকে আহত করা, পুরুর মাটিতে পড়ে যাওয়া, বন্দী পুরুর পালঙ্ক থেকে উঠে তক্ষশীলকে আক্রমণ করে তাকে নিহত করা প্রভৃতি যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা থিয়েটারি বা যাত্রার ঢঙেও বিবৃত হয়েছে বলে মনে হয় । এলবিলা এবং পুরুর ক্রোধ প্রকাশ করবার জন্য তাঁদের সংলাপে

২৩। শক্তি ভট্টাচার্য — "বাঙলা ঐতিহাসিক নাটক" (১৩৭৪) পৃঃ ৮০

২৪। বৈদ্যনাথ শীল — "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা" (১৩৬৪) পৃঃ ৩৩

'তুই' সম্বোধন যুক্ত হয়েছে। এটি আধুনিক দৃষ্টিতে রুচিকর বলে মনে হয় না। এলবিলা তক্ষশীলের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন, 'ভীরু! তোর কথায় আমি ভুলিনে।' (২য় অঙ্ক) পুরুত্ত ও এলবিলার চরিত্রে সন্দেহ করে তাঁকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'কুহকিনীর বাক্যে আমি আর মুগ্ধ হই নে'। এবং এলবিলার হস্ত ঠেলে ফেলে দিয়ে 'যাযাবিনি! আমাকে স্পর্শ করিস নে।" (৫ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) পুরু পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন তথাপি তিনি যেভাবে এলবিলার প্রতি অশালীন আচরণ করেছেন তা সমর্থনীয় নয়। সেকন্দর শার পুরুহানের পর হতাশ অম্বালিকার কণ্ঠে যে সংগীতযুক্ত হয়েছে তার ভাষাও শালীন নয়। যথা 'আগে করিয়া যতন, কেন মজাইলে মন। / প্রেমফাঁসি গলে দিয়ে বধিলে জীবন॥ / ভালো ভালো ভালো হল, দু-দিনে সব জানা গেল, / দিলে ভালো প্রতিফল, রহিল স্মরণ॥' (৫ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন এবং বাঙলা ঐতিহাসিক নাট্যধারায় একটি স্বতন্ত্র সুরের সংযোজন করেছিলেন তাই আমরা তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের বিস্তৃত আলোচনা করে এই সত্যের প্রতিই অঙ্গুলিনির্দেশ করতে চাইযে, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা কীর্তন করিবার নামে এই প্রকার কয়েকখানি রোমান্টিক নাটক মাত্র রচনা করিয়াছেন।"[২৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে উনিশ শতকের শেষ ভাগে উদ্ভূত ভারতীয় জাতীয়তা বোধের যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন সেই আদর্শই পরবর্তীকালে নানাভাবে অনুসৃত হয়েছে। 'পুরুবিক্রমে' এই আদর্শের প্রথম প্রকাশ। তাঁর আগে জগবন্ধু ভদ্রের 'দেবলাদেবী' অঙ্ক এবং প্রাণনাথ দত্তের 'সংযুক্তা সুয়ম্বর' নাটকে ও এই আদর্শের জয়গান করা হয়েছে তবে তাঁদের নাটকে এই সুর প্রাবল্যলাভ করে নি যেমন করেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে। 'পুরুবিক্রম' নাটকে উদাসিনীর বিখ্যাত গান 'মিলে সব ভারতসন্তান একতান মন প্রাণ / গাও ভারতের যশোগান।" সঙ্গীতটি দেশপ্রীতি জাগ্রত করতে অদ্বিতীয়। এই গান শুনে এলবিলা বলেছেন, "যাও, তুমি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে এই গানটি গাওগে। যতদিন না হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি এক উৎসাহনলে প্রজ্বলিত হয় ততদিন তোমার কার্য শেষ হল, এরূপ মনে করো না", (১ম অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক) পুরুর সৈন্যগনও 'জয় ভারতের জয়' এবং 'যবন - শোণিত - বৃদ্ধি করুক বিধান, / ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।' (৩য় অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক)

২৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য, "বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস" ১ম খণ্ড (১৯৬০) পৃঃ ৩২৭

প্রভৃতি উক্তি করে তাদের ভারতবোধের পরিচয় দিয়েছে। এই ভারতবোধ প্রচারের মাধ্যম হিসাবেই 'পুরুবিক্রম' নাট্যকার রচনা করেছিলেন। এই নাটকের ঐতিহাসিক চরিত্র তিনটি। পুরু, তক্ষশীল এবং আলেকজাণ্ডার। পুরুকে দেশপ্রেমিক বীর নৃপতি ও ঈর্ষাকাতর প্রণয়ীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পুরুর দেশপ্রেমে কোনো দ্বন্দ্ব নেই তাছাড়া তাঁর সংলাপের ভাষা কৃত্রিম বলে তাঁর চরিত্র সজীবতা লাভ করতে পারে নি। তক্ষশীলের সঙ্গে বাদানুবাদে ভাষাগত আড়ষ্টতার জন্য পুরুর পৌরুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। পুরু বলেছেন ঃ "মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে বিদেশীয় রাজার আক্রমণ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অতীব পূজ্য হন।

তক্ষশীল। এইরূপ বাক্য গর্বিত উদ্ধত লোকেরই উপযুক্ত।

পুরু। এরূপ বাক্য রাজগণের আদরনীয়, রাজকুমারীগণের ও আদরনীয়।"

(১ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক)

পুরু দেশপ্রেমে কোনো দ্বন্দ্ব দেখানো হয় নি কিন্তু তাঁর প্রণয়ে ঈর্ষাকাতরতা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তিনি তক্ষশীলকে হত্যা করে প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছেন। তক্ষশীলের অন্তিম প্রতারণা পুরুকে আবার সন্দেহ অনলে জর্জরিত করে তুলেছে তিনি মূর্ছা গিয়েছেন। এলবিলার প্রতি পুরুর হৃদয়হীন আচরণ তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে নি। সেজন্যই এলবিলার সঙ্গে তাঁর মিলন দৃশ্য প্রত্যাশিত মাধুর্য্যের সৃষ্টি করতে পারেনি। ইতিহাসের পুরুর বীর্যবত্তা, আত্মমর্যাদা এবং নির্ভীকতা নাটকে পরিস্ফুট হয় নি। আলেকজাণ্ডার সম্বন্ধে ও একই কথা। ইতিহাসকীর্তিত তাঁর বীরত্ব নাটকে স্থান পায়নি। বরং একজন সৈনিকের সাহায্য নিয়েই তাঁকে প্রাণরক্ষা করতে হয়েছে। সেজন্য তিনি সেই নরাধমকে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন কিন্তু তাঁতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়নি। এফেস্টিয়নের প্রতি তিনি আদেশ করেছেন, "হস্তে অস্ত্র ধারণ করেও যে পামরগণ যুদ্ধ নিয়মের অনভিজ্ঞ তারা এখনি আমার সৈন্যদল হতে দূরীভূত হউক।" (৩য় অঙ্ক /১মগর্ভাঙ্ক) এখানে যুদ্ধ নিয়ম বলতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু নিয়ম রক্ষক আলেকজাণ্ডারকে বড় করতে গিয়ে বীর আলেকজাণ্ডারকে ছোটো করা হয়েছে। যিনি দ্বৈরথ সমরে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পরাজিত হন তাঁর পক্ষে কোনোরূপ আস্ফালন করাই শোভনীয় নয়।

পুরুর মত আলেকজাণ্ডারকে ও প্রেমিকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। আলেকজাণ্ডারের দূত এফেস্টিয়ন অম্বালিকার নিকটে এসে বলেছে, "যেমন এখন সমস্ত ভারতভূমির শান্তি তাঁর উপর নির্ভর কচ্ছে, তেমনি তাঁরও হৃদয়ের শান্তি একমাত্র আপনার উপর নির্ভর কচ্ছে।" (২য় অঙ্ক) এবং "যেদিন অবধি আপনি তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছেন, সেইদিন অবধি

তিনি বিরহ জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন।" (২য় অঙ্ক) আমরা নাটকে আরো জানতে পারি যে আলেকজাণ্ডার তক্ষশীলের রাজপ্রাসাদে ঢুকে অম্বালিকাকে বন্দী করে নিয়ে যান। তারপর অম্বালিকা পালিয়ে এলে আলেকজাণ্ডার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর কাছে প্রতিদিন দূত প্রেরণ করতেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর প্রণয়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করেছেন। অম্বালিকার প্রেমের সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁকে তাঁর ভ্রাতা তক্ষশীলকে প্রতিনিবৃত্ত করবার কাজে লাগিয়েছেন। এখানে তাঁর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিণতিতেও দেখা যায় আলেকজাণ্ডার তাঁর প্রণয়িনীর কাতরতায় কর্ণপাত না করে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। অম্বালিকা ব্যগ্রচিত্তে বলেছেন, "রাজকুমার। আপনার সঙ্গে আমি সকল ক্লেশ, সকল বিপদ সহ্য কত্তে পারব। অরণ্যে যান, — মরু ভূমি যান — সমুদ্রে যান পর্বতে যান — যুদ্ধক্ষেত্রে যান, আপনার সঙ্গে আমি কোনো স্থানে যেতে ভয় করব না।" (৫ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁর আকুতির কোনো মর্যাদা রাখেন নি। তিনি স্বগতোক্তিতে জানিয়েছেন, 'আমি যে এমন পাষাণ — হৃদয়, ওঁর ক্রন্দন শুনে আমারও হৃদয় বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। যাওয়া যাক — আর এখানে থাকা নয়, এখনও অনেক দেশ জয় কত্তে বাকি আছে"। (৫ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) দেখা যাচ্ছে আলেকজাণ্ডারের প্রণয়ভাণ মাত্র। বড়জোর তা রূপমোহ। অতএব দিগ্বিজয়ী বীর বা অকৃত্রিম প্রণয়ী কোনোরূপেই আলেকজাণ্ডার নাটকে উজ্জ্বলতা লাভ করেননি।

তক্ষশীলের পুরুর প্রতি ঈর্ষ্যা ইতিহাসে স্বীকৃত ঘটনা। পুরুর ছিলেন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী।[২৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে পুরুর প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেও চিত্রিত করেছেন। কিন্তু তক্ষশীল সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন। তাঁর ভগ্নীর দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। তাঁর প্রণয়ও অকৃত্রিম ছিল না। অনেকটা খলচরিত্রের অনুসরণে তাঁকে আঁকা হয়েছে। তাঁর পরিণতি সেই কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

অনৈতিহাসিক প্রধান দুটি চরিত্রই নারী চরিত্র। কুলু পর্বতের রাণী এলবিলা এবং তক্ষশীলের ভগ্নী অম্বালিকা সম্পূর্ণ কালপনিক চরিত্র। এলবিলার চরিত্রে পূর্বাপর সঙ্গতি আছে। তিনি পুরুর প্রেমেই দেশরক্ষায় আগুয়ান হয়েছেন। পুরুকে যুদ্ধে উৎসাহিত

২৫। তিনি যখন বুর্যা-রায় যুদ্ধরত, তখনই পাঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলার বৃদ্ধ রাজার পুত্র আম্ভিকতকটা ভয়ে ও কতকটা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অধীশ্বর পুরুর শক্তি খর্ব করিবার জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আনুগত্য স্বীকার করেন।" ভারতকোষ (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৩৭৭

করবার জন্য তিনি জীবন বিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হননি। তাঁর প্রণয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। পুরুর কাছ থেকে অবহেলা পেয়েও তাঁর প্রেম বিচলিত হয় নি। তিনি নিজেকেই দোষী গন্য করে আত্মহত্যায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের স সহানুভূতি জাগ্রত থাকে। অম্বালিকা চরিত্রটি গতিশীল। নিজের ভাইকে তিনি সু সুকৌশলে সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছেন। সেকন্দর শার সমর্থন নিয়ে তক্ষশীলের সঙ্গে এলবিলার মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে পুরু ও এলবিলার মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়েছেন। এ সমস্তই তিনি করেছেন, তাঁর দুই প্রিয় পুরুষের মঙ্গল কামনায়। কিন্তু তথাপি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। তক্ষশীল পুরুর অস্ত্রে প্রাণ দিয়েছেন, সেকন্দর শা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। তখন অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন এবং পুরু এলবিলার মিলন ঘটিয়ে পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সংসাধন করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকে অম্বালিকার মতো – ক্রিয়াশীল চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন অতিনাটকীয় হলেও তা অতীতের পটভূমিতে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

সরোজিনী (১৮৭৮)

'পুরুবিক্রম' যেমন প্রামাণিক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত সরোজিনী সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। আলাউদ্দীন খিলজির চিতোর আক্রমণ ও চিতোর ধ্বংসের ঐতিহাসিক ঘটনা নাটকটির পটভূমিকায় রয়েছে কিন্তু নাটকের মূলকাহিনী ও চরিত্র কিছুটা টডের 'রাজস্থানের' ১ম খণ্ডের অ্যানালস অব মেওয়ারের" ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে গৃহীত এবং অধিকাংশই নাট্যকারের উদ্ভাবিত। লক্ষ্মণ সিংহের দৈববানী শ্রবণে কন্যা সরোজিনীর বলিদানের উদ্যোগ, বাদলাধিপতি বিজয়সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর বলিদানের উদ্যোগ, বাদলাধিপতি বিজয়সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহদানের মিথ্যা প্রচার, পরিশেষে সঙ্কট থেকে উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনার কলপনা করা হয়েছে ইউরিপিডিসের 'ইফিজেনিয়া ইন অলিস' নাটক থেকে। লক্ষ্মণ সিংহের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও দুর্বলতা, রাজমহিষীর কাতরতা, সরোজিনীর সরলতাপূর্ণ চরিত্র প্রভৃতির আদর্শ সম্ভবত নেওয়া হয়েছে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক থেকে। চিতোরের কুল-দেবতা চতুর্ভুজা দেবীর পুরোহিত ভৈরবাচার্য এবং তার কুটিল ষড়যন্ত্র, বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ ও গোরাধিপতি রণধীর সিংহের বিবাদ, রোশেনারার বলিদান, প্রভৃতি

ঘটনা নাট্যকারের সম্পূর্ণ কল্পিত । রোশেনারা চরিত্রটি এবং বিজয়সিংহের প্রতি তার প্রণয়কাহিনী হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের আয়েসা জগৎসিংহের আখ্যান অংশ থেকে অনুপ্রাণিত । টডের 'রাজস্থান' থেকে ভীমসিংহ ও তাঁর পত্নী পদ্মিনীর কাহিনী, চতুর্ভুজাদেবীর দৈববাণী, লক্ষ্মাসিংহের একাদশপুত্রের যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ, আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর ধ্বংস এবং পদ্মিনী প্রমুখ পুরনারীদের জহরব্রতে মৃত্যুবরণ প্রভৃতি ঘটনা গৃহীত হয়েছে । টডের 'রাজস্থানে'র যে ঘটনাগুলি নাটকে স্থান পেয়েছে সেগুলির বিচারেই 'সরোজিনী'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা হয়ে থাকে । কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করে দেখিয়েছি যে 'রাজস্থান' গ্রন্থে অধিকাংশ তথ্যই ঐতিহাসিক সত্যানুমোদিত নয় । আলাউদ্দীন খিলজীর চিতোর আক্রমণের মূলকারণ পদ্মিনীর রূপসৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ঘটনারই প্রামাণিকতা কতদূর তা বলা মুশকিল । রাজপুত ইতিহাসের আধুনিক গবেষক পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমনের ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যা বলেছেন সংক্ষেপ করলে তা দাঁড়ায় এরূপ, "আলাউদ্দীন ছয় মাস অবরোধের পর চিতোর দুর্গ দখল করেন । চিতোরের রাজা রতন সিংহ, লক্ষ্মাসিংহ প্রভৃতি অনেক সামন্তের সহিত এ যুদ্ধে মারা যান । তাঁহার রানী পদ্মিনী বহু স্ত্রীগণের সহিত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন করেন । এই প্রকারে চিতোর দুর্গে অলপদিনের জন্য মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয় – বাকী সমস্ত কথা বহুধা কল্পনামূলক ।"[২৬] টড কথিত মেবারের রাণা লক্ষ্মাসিংহ (Lakumsi -) কর্তৃক দৈববাণী শ্রবণ সম্পূর্ণই কবিকল্পিত ব্যাপার বলেই মনে হয় । টড লিখেছেন, '..... the Rana, after an arduous day, stretched on his pallet, and during a night of watchful anxiety, pondering on the means by which he might preserve from the general destruction one at least of his twelve sons; when a voice broke on his solitude, - exclaiming 'Myn bhooka ho' and raising his eyes, he saw, by the dim glare of the cheragh, advancing between the granite columns, the majestic form of the guardian goddess of chettore."[27]

২৬। কালিকারঞ্জন কানুনগো – "রাজস্থান কাহিনী" (১৩৭২) পৃ ২২৯

২৭। J. Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol.1 (London, 1957), Page 214.

এই অবাস্তব ঘটনা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অনুসরণ করেননি । মূলে আছে লক্ষ্মণসিংহ ঘাসের খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে দৈববাণী শুনলেন আর নাট্যকার বর্ণনা করেছেন চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির সম্মুখীন স্থানে লক্ষ্মণসিংহ চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সাক্ষাৎ করলেন । নাট্যকারের পরিবর্তন নিশ্চয়ই অধিকতর সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়েছে সন্দেহ নেই এবং এরূপ কর্মে নাট্যকারের সম্পূর্ণ অধিকার আছে । টডের বর্ণনা অনুযায়ী দৈববাণীতে কেবল দ্বাদশ রাজপুত্রের যুদ্ধে প্রাণোৎসর্গের আদেশই দেওয়া হয়েছে কিন্তু নাটকে বর্ণিত দৈববাণীর প্রথম অংশ নাট্যকারের কল্পনা – 'মূঢ় ! বৃথা যুদ্ধ সজ্জা যবন –বিরুদ্ধে ।

রূপসী ললনা কোনো আছে তব ঘরে,
সরোজ–কুসুম–সম, যদি দিস দিতে
তারই উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে । কহিলাম তোরে ।'
(১ম অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক)

গোরাধিপতি রণধীরের সামনে চতুর্ভুজা মূর্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবের উল্লেখও টডে নেই । দৈববাণীকে কেন্দ্র করে রণধীর সিংহ ও বিজয়সিংহ এই দুই রাজপুত্র প্রধানের কলহের কথাও টড বর্ণনা করেননি । বরং 'রাজস্থানে' আছে, 'A generous contention arose amongst the brave brothers, who should be the first victim to avert the denunciation.'[28]

তাছাড়া দৈববাণীর সমস্তটাই ভৈরবাচার্যের ষড়যন্ত্র এটাও নাট্যকারের সংযোজন । সরোজিনীতে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন বিজয়সিংহ সমস্ত দৈববাণীকে অস্বীকার করে মন্তব্য করেছেন, "আর দেবতারা যে এরূপ অন্যায় আদেশ করবেন তাও আমি কখনো বিশ্বাস কত্তে পারি নে । যে এরূপ কথা বলে, সে দেবতাদের অবমাননা করে, সেই দেব – নিন্দুকের কথা আমি শুনি নে ।" (৪র্থ অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক) পদ্মিনীর কাকা (Uncle –) গোরা এবং ভাইপো (Nephew) বাদল নাটকে পরিবর্তিত হয়ে গৃহীত হয়েছেন । রণধীর সিংহকে গোরাধিপতি এবং বিজয় সিংহকে বাদলাধিপতিরূপে কল্পনা করা হয়েছে । টড বলেছেন যে পদ্মিনীর রূপলাবণ্যের লোভেই আলাউদ্দীন

২৮। J. Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I (London, 1957), Page-215.

চিতোর আক্রমণ করেন । এবং তিনি তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেই পুনর্বার চিতোর আক্রমণ করেন । নাটকে দেখানো হয়েছে যে পদ্মিনীর জন্যই আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন ঠিকই তবে রাজপুত প্রধানদের অনুর্কলহের সুযোগ গ্রহণ করেই তিনি এ কার্যে অগ্রসর হন । এইভাবে নাট্যকার আলাউদ্দীনের বাহুবলের সঙ্গে কূটনীতির ও যোগ করেন । নাটকে আছে যে লক্ষ্মণসিংহ যুদ্ধে যাবার আগে রাজমহিষীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং তাঁর বিদায় নেবার পর রাজমহিষী সরোজিনী, পদ্মিনী প্রভৃতি অন্তঃপুরিকারা জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন করেন । কিন্তু রাজস্থানের বর্ণনা অন্যরূপ । সেখানে আছে রাণা যুদ্ধে যাবার আগেই জহরব্রত অনুষ্ঠান হয় । 'But another awful sacrifice was to precede this act of self-devotion, in that horrible rite, the Johur, where the females are immolated to preserve them from pollution or captivity'.

এইভাবে নাট্যকার নাটকে 'রাজস্থানের' তথ্যাদিরও অল্পস্বল্প পরিবর্তন করেছেন । কিন্তু তিনি যে সরোজিনীকে কেন্দ্র করে বিপুল ঘটনাজালের সৃষ্টি করেছেন তার আভাসমাত্র নেই 'রাজস্থানে' । লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশপুত্রের কথাই আছে কন্যার উল্লেখমাত্র নেই । টডের কাহিনীর নায়িকা পদ্মিনীর নাটকে উপস্থিতি পর্যন্ত নেই । বিবৃতির মাধ্যমে পদ্মিনীর কাহিনী জানানো হয়েছে । অতএব সরোজিনী নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে নাট্যকার 'রাজস্থান' থেকে পটভূমিকামাত্র নিয়েছেন মূল ঘটনা ও প্রধান চরিত্রাদি প্রায় সমস্ত কিছুই তাঁর কল্পিত । রাণা লক্ষ্মণসিংহ এবং তাঁর মহিষী এই চরিত্রদুটি মাত্র নাট্যকার 'রাজস্থান' থেকে নিয়েছেন । প্রথমত 'রাজস্থানকে' ইতিহাস গ্রন্থ বলা যায় না দ্বিতীয়ত সেই 'রাজস্থানের' প্রধান ঘটনাগুলি ও নাটকে নেই তৃতীয়ত 'রাজস্থানের' উল্লিখিত ঘটনাগুলিও নাট্যকার প্রায়শঃই পরিবর্তিত করে বর্ণনা করেছেন । কাজেই 'সরোজিনী'কে অন্তত বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না । ইতিহাসাশ্রিত নাটক হিসাবেই 'সরোজিনী' গৃহীত হবার যোগ্য ।

যে দেশাত্মবোধ 'পুরুবিক্রম' নাটক রচনার মূল প্রেরণা ছিল সেই দেশাত্মবোধ 'সরোজিনী' নাটক সৃষ্টিতেও সক্রিয় ছিল তা বলা যায় না । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'কাহিনী - বিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে ইহাতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী নাটকখানির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও ইহার মধ্যে নাট্যকারের দুই একটি

২৯। J. Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol.1(London,1957), Page -215.

মৌলিক গুণ ও প্রকাশ পাইয়াছে — দেশাত্মবোধের ভাবটি ইহাতে প্রত্যক্ষ না হইয়া বরং এই মৌলিক নাট্যগুণই ইহার মধ্যে অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হইবে।"[৩০] এ নাটকের প্রথমেই দৈববাণী শোনার পর রাণা লক্ষ্মণসিংহ দেশরক্ষায় উদ্দীপিত না হয়ে বরং নানা দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছেন। তিনি স্বগতোক্তি করেছেন, "আর — বাপ্পা বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে একে একে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিলে তবে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাকবে। এও বা কি ভয়ানক কথা! যাই হোক — আমার দ্বাদশ পুত্র যবনযুদ্ধে যদি প্রাণ দেয় তাতেও আমার উদবেগের কারণ নাই — কেননা 'রণে প্রাণত্যাগ করাই তো রাজপুত পুরুষের প্রধান ধর্ম," (১ম অঙ্ক/ ১ম গর্ভাঙ্ক) দেশরক্ষায় কৃতসংকল্প রাজপুতবীরের মুখে এই উক্তি কি শোভা পায়? কেন না 'রণে প্রাণত্যাগ করাই তো রাজপুত পুরুষের প্রধান ধর্ম' — এই যুক্তি দিয়ে যদিও তিনি ভয়ানক কথাকে ঢাকতে চেয়েছেন কিন্তু তাতে তাঁর দ্বিধা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে নি। এমন কি রণধীরের উৎসাহবাণী, "প্রজাপুঞ্জের জন্য রাজার সকল ত্যাগ, সকল ক্লেশ স্বীকার করা উচিত" শুনে ও রাণা হৃদয়মধ্যে তেমন উদ্দীপনা অনুভব করতে পারেননি। কোনো ক্রমে নিজের বিবেককে চাপা দিয়ে অধীরভাবে বলে উঠেছেন, 'রণধীর যথেষ্ট হয়েছে আর না।" যদি দেশানুরাগই নাটকের মূলভাব হত তাহলে রাণার দ্বন্দ্ব, রাজপুত প্রধানদের কলহ, রাজমহিষীর কাতরতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এত প্রাধান্য পেত না। তাছাড়া দৈববাণী যে সম্পূর্ণ ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্যের চক্রান্ত এই সংবাদ জানবার পর দৈববাণীর নির্দিষ্ট সরোজিনীর বলিদানের মধ্য দিয়ে দেশরক্ষার জন্য আত্মত্যাগের মহিমাও পরিস্ফুট হতে পারেনি। সরোজিনী যখন বলেন, "পিতঃ! আমার জন্যে আপনি কেন তিরস্কারের ভাগী হচ্ছেন? যদি আমার এই ছার জীবনের বিনিময়ে শত শত কুলবধূ অস্পৃশ্য অপবিত্র যবন — হস্ত হতে নিস্তার পায় তা হলেই আমার এই জীবন সার্থক হবে।" (৫ম অঙ্ক / ৩য় গর্ভাঙ্ক) তখন দর্শক বা পাঠক হৃদয়ে অনুরূপ উৎসাহভাবের সঞ্চার হয় না কারণ তারা জানে যে সরোজিনীর বলিদানের ফলে সরোজিনীর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না বরং তার বিপরীতই হবে। যে ষড়যন্ত্র চিতোর ধ্বংসের মূল কারণ বলে কল্পিত হয়েছে সেই ষড়যন্ত্রই নাটকে প্রধান অংশ জুড়ে থাকবার ফলে দেশ প্রেমের আবেগের পরিবর্তে একপ্রকার করুণ রসই নাটকে প্রাবল্যলাভ করে। সমাপ্তি সঙ্গীতটি তো রীতিমত বিয়োগবিধুর। মেবারপতন দেখে রামদাসের মনে মেবার —

৩০। আশুতোষ ভট্টাচার্য, "বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস" ১ম খণ্ড (১৯৬০) পৃষ্ঠ ৩৩২

উদ্ধারের কোনো প্রেরণা জাগেনি । পরাজয় বরণ করে তিনি মৃত্যু কামনা করেছেন তাঁর সঙ্গীতের শেষ ছত্রে । সেখানে তিনি গেয়েছেন,—

'রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে ,
যবনিকা পড়ে যাক জীবনে আমার ।'

এমন কি 'জ্বল জ্বল চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' গানটিতেও অসহায়তার করুণ ধ্বনি মূর্চ্ছিতহয়ে আছে । রাজপুত মহিলাদের অভিশাপ —

"শোন রে যবন ! শোনরে তোরা ,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি আজ সবে ,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥ "

যথেষ্ট বলিষ্ঠতা এখানে পাচ্ছি কোথায় ? আর্তনাদ নেই তবে দেবতাদের দোহাই দিয়ে নিজেদের নিস্ফলতা দূর করবার প্রয়াস রয়েছে । এই প্রয়াস পরাজয় স্বীকারের নামান্তর । নাটকমধ্যেও বিচ্ছিন্নভাবে দেশপ্রেম উদ্বোধক সংলাপ কমই আছে । বিজয় সিংহের মুখে আমরা যেন বিবেকানন্দের ওজস্বিনী মন্ত্রের পূর্বাভাস শুনতে পাই । "যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য করতে বলছেন তখন তাই যথেষ্ট, আর — কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই । মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী ।" এবং 'মহারাজ ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে , যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে ? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি ।' (২য় অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) এ ছাড়া নাটকের আর কোনো চরিত্রের মুখে দেশাত্মবোধক কোনো উৎসাহবাণী সংযোজিত হয় নি । রাণা তো দৈববাণী নিয়েই বিব্রত , চিতোর বা দেশরক্ষার ব্যাপারে তেমন কোনো উদ্যোগই নিতে পারেন নি । শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তিনি মহিষীকে বলেছেন, 'আমি বিদায় হলেম, যদি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি — চিতোরের গৌরব রক্ষা করতে পারি তাহলেই পুনর্বার দেখা হবে, নচেৎ এই শেষ দেখা ।' (ষষ্ঠ অঙ্ক) এখানেও গতানুগতিক যোদ্ধার বিদায়বাণীই রাণার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে । 'শুক্ল বিক্রম' নাটকের উদাসিনী চরিত্রের মত কোনো চারুণী চরিত্র ও এ নাটকে কল্পিত হয়নি । যদি ও দেশাত্মবোধের আবেগ সঞ্চার করবার পক্ষে এ ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করবার অবকাশ এখানে প্রচুরই ছিল । কাজেই দেশাত্মবোধ 'নবোজিনী' নাটকের মূলভাব নয় । নাটকের নামকরণ থেকেও এই সত্য প্রতীত হয় যে

অসহায়া সরোজিনীর ট্র্যাজেডিই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় , দেশানুরাগ নয় । 'পুরুবিক্রম' নাটকে প্রণয়, দেশপ্রেম এই দুইভাবই প্রাধান্য পেয়েছে । 'সরোজিনী' নাটকে প্রণয়ভাব থাকলেও তা মোটেই প্রাবল্যলাভ করেনি । সরোজিনী বিজয়সিং রোশেনারার ত্রিভুজপ্রেম স্পষ্ট হয়নি । রোশেনারাকে প্রেমিকারূপে ততোটা মানায় নি যতোটা - মানিয়েছে খলচরিত্ররূপে । বিজয়সিংহের রূপ দেখে তাঁর প্রতি হৃদয়মন সমর্পন করা - অস্বাভাবিক নয় । কিন্তু সরোজিনীকে সপত্নীরূপে বিবেচনা করে তার অমঙ্গল কামনা করা কিরূপ প্রেমের ধর্ম ? রোশেনারা তার সখীকে স্পষ্টই বলেছে, 'আমার বলবার অধিকার থাক বা না থাক, আমি তাই সরোজিনীকে আমার সপত্নী বলে মনে করি । সখি । আমার সপত্নীর ভালো আমি প্রাণ থাকতে কখনোই দেখতে পারব না । '(২য় অঙ্ক । ২য় গর্ভাঙ্ক) প্রিয়জনের স্নেহভাগিনীর প্রতি ঈর্ষা বোধ করা অসঙ্গত নয় বরং মনুষ্যত্ব সম্মত কিন্তু রোশেনারা সরোজিনীর রক্তের জন্য যেমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাতে তার - প্রণয়ের প্রতি সহানুভূতি রাখা যায় না । রোশেনারার প্রণয় নয়, প্রতিশোধস্পৃহাই নাটকে বেশ কিছু অংশ জুড়ে আছে কিন্তু সেখানেও দৈবের নিষ্ঠুরতাই প্রাধান্য লাভ করেছে । প্রেমের ললিত মধুর সৌরভ চক্রান্তের বিভীষিকা জালের মধ্যে বিকশিত হতে পারে নি । নাটকের প্রারম্ভে বিজয়সিংহ তার সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহের সংবাদ শুনে উৎফুল্ল হয়ে বলেছে, "মহারাজ । একটা জনরব শুনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি - শুনতে পাই নাকি রাজকুমারী সরোজিনীকে এখানে এনে তাঁর সহিত উদবাহ - বন্ধনে আমাকে চিরসুখী করবেন ? "(১ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) এখানেই প্রেমের মধুর তান সর্বপ্রথম ঝংকৃত হয়েছে । কিন্তু বিজয়সিংহ সরোজিনীর প্রেম বিস্তার লাভ করতে পারল না । লক্ষ্মণসিংহের মতপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মনেই সংশয়ের মেঘ দেখা দিয়েছে । সরোজিনী ভেবেছে রোশেনারার উপর বিজয়সিংহের মন পড়েছে । বিজয়সিংহ ও সরোজিনীর মন বুঝতে না পেরে দ্বিধান্বিত হয়েছেন । তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের ভুলবোঝা বুঝির অবসান হয়েছে । লক্ষ্মণসিংহের কপট উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে বিজয় সিংহ এবং সরোজিনী যখন মিলনের কল্পনায় রঙ্গীন তখনই ভগ্নদূতের মত রামদাস প্রবেশ করে সবলে মিলনের স্বপ্নকে ধুলায় লুটিয়ে দিল । আসন্ন বিপদের পটভূমিকায় বিজয়সিংহের প্রণয় ক্রোধের রক্তিম দীপ্তিতে পরিবর্তিত হয়েছে । বিজয় সিংহ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বলেছেন, "রাজকুমারী । আমি বেঁচে থাকতে কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায় ? যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে ততক্ষণ তোমার আর কোনো ভয় নেই । রাজকুমারি ! এখন শুধু তোমাকে রক্ষা কত্তে পাল্লেই যে আমি যথেষ্ট মনে করব

তা নয় — আরো, যে নরাধম আমাকে প্রতারণা করেছে তাকেও এর সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে আমি কখনোই নিবৃত্ত হব না । ... রাজকুমারি ! আমার আর সহ্য হয় না, এই উলঙ্গ অসিহস্তে এখন আমি চললেম, দেখি, তিনি কেমন ’(৩য় অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) । এখানে আমরা প্রেমিক বিজয়সিংহের চেয়ে ক্রোধকাতর বিজয়সিংহকেই অধিকতর প্রত্যক্ষ করি । এই ক্রোধের জন্যই বিজয়সিংহ আর সরোজিনীর মধ্যে দূরত্ব বর্দ্ধিত হয়েছে । সরোজিনীকে রক্ষার্থে বিজয়সিংহ যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তাতে তার ‘শিভালরি’ যতোটা প্রমাণিত হয়েছে প্রেমিকত্ব ততোটা হয়নি । সরোজিনীর প্রেমকে সে অধিকারের বিষয় করে তুলে বলেছে, ‘আপনার স্মরণ হয়, আমার সহিত সরোজিনীর বিবাহ দেবেন বলে আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন — এখন সেই অঙ্গীকার সূত্রেই — সরোজিনীর প্রতি আমার ন্যায্য অধিকার ।’ (৪র্থ অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক) । এই অধিকার রক্ষার জন্য সে এত তৎপর যে সরোজিনীর হৃদয়কে বুঝবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করে নি । সে পুরোহিত, ঘাতক , তার সহকারী , এমন কি রাণা লক্ষ্মণসিংহকেও হত্যা করে সরোজিনীকে উদ্ধার করবার সংকল্প প্রকাশ করেছে । শেষ পর্যন্ত তার মন্দ সংকল্প রক্ষিত হয়েছে । বিজয়সিংহ জল্লাদের উদ্যত খড়্গাঘাতের আঘাত থেকে সরোজিনীকে উদ্ধার করেছে । তবে মিলনের সাধ পূর্ণ হল না । বিজয় সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে, সরোজিনী অনলকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিল । এইভাবে নাটকমধ্যে দৈবের নিষ্ঠুর বিধান, প্রেমের মধুর আলাপকে ম্লান করে সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিয়েছে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একমাত্র ‘সরোজিনী’ নাটকেই রোমান্টিক প্রণয়ের আতিশয্যের রাশ আলগা হতে দেননি । এদিক থেকে প্রশংসা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য ।

চরিত্রচিত্রণেও নাট্যকারের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত । প্রথমেই রাণা লক্ষ্মণ সিংহ তাঁর সঙ্কট, তাঁর দুর্বলতা, তাঁর বাৎসল্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হন । লক্ষ্মণসিংহের ট্র্যাজেডি প্রদর্শনই নাটকের প্রধান বিষয়, লক্ষ্মণসিংহই নায়ক ,তিনিই নাটকের প্রধান চরিত্র । ভৈরবাচার্যকৃত দৈববাণীর ব্যাখ্যা শুনে লক্ষ্মণসিংহের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে লক্ষ্মণসিংহ আৎকে উঠে বলেছেন ‘কি বললেন ? সরোজিনীর ? রাজকুমারী সরোজিনীর ? আমার প্রাণের দুহিতা সরোজিনীর ?’ (১ম অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক) প্রাণের দুহিতা সরোজিনী কথার মাধ্যমে লক্ষ্মণসিংহের ব্যথার স্থান কোথায় তা ভালোভাবেই বোঝানো হয়েছে । লক্ষ্মণসিংহের দ্বন্দ্বও এই দৃশ্যে সম্যক পরিস্ফুট হয়েছে । রণধীর সিংহের সঙ্গে আলোচনায় লক্ষ্মণসিংহের দুর্বলতাও ধরা পড়ল । দেবী চতুর্ভুজার আবির্ভাব ও ভ্রূকুটিনিক্ষেপ লক্ষ্মণসিংহের চারিত্রিক দুর্বলতারই

সঙ্কেত । রণধীরের পরুষবচনে তিনি হৃদয়ের সম্মতির বিরুদ্ধেই সরোজিনীকে বলিদানের উদ্দেশ্যে অক্ষ্ণহলে আনবার জন্য পত্র লিখলেন । লিখেই পরক্ষণে বিলাপে অধীর হয়ে ওঠেন ।'কে সরোজিনী, আমি তাজানি না । এ সংসারে সকলি মায়াময়, সকলি ভ্রান্তি ,সকলি স্বপ্ন । হে মহাকাল – রূপিণি প্রলয়ঙ্করি মাতঃ চতুর্ভুজে ! ~~সর্বভূতময়~~ তোমার সর্বসংহারকার্যে সহায়তা কত্তে এখনি আমি চললেম । যাক.– সৃষ্টি লোপ হয়ে থাক, পৃথিবী রসাতলে যাক । মহাপ্রলয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন হয়ে যাক, আমার তাতে কি ক্ষতি ? আমার সঙ্গে কারো কোনো সম্বন্ধ নাই ।'(১ম অঙ্ক /১ম গর্ভাঙ্ক) । দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভৃত্য রামদাসের নিকটে লক্ষ্মণসিংহের আবার ভিন্ন চিত্র । এখানে তিনি বিনিদ্র, নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন,'সেই সুখী যে রাজপদের মহানভার হতে মুক্ত ,যে সামান্য অবস্থায় মনের সুখে কাল যাপন করে ।'ইফিজেনিয়া ইন অলিস' নাটকের আগামেমনন ও অনুরূপ উক্তি করেছেন,

> & 'I envy thee, old man;
> I envy all,who pass their lives
> secure
> From danger to the world,to fame,
> unknown.' [31]

রাণা লক্ষ্মণসিংহ নিজের মনে জানেন যে দেবী চতুর্ভুজা কখনই এরূপ নিষ্ঠুর বলি চাইতে পারেন না কিন্তু আবার রণধীরের জ্বালাময়ী ভাষণ শুনেই মত পাল্টান । তথাপি তিনি যথেষ্ট দৃঢ় হতে পারেন না । মহিষীকেও তাঁর ভয় । রণধীরকে বারণ করে দেন এই বলে –"বিশেষত একথা যেন মহিষীর কানে না ওঠে । তিনি একথা শুনতে পেলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হবে । রণধীর । আমি কৃতসংকল্প হয়েছি , এখন কেবল মহিষীকে সরোজিনীর জননীকেই ভয় ।"(১ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) কিন্তু কৃত সংকল্প হওয়া তাঁর চরিত্রে নেই রণধীর প্রস্থান করলেই তিনি হাহাকারে ফেটে পড়েন,'হিমাচল ! বিন্ধ্যাচল ! তোমাদের কঠিনতম দুর্ভেদ্য পাষাণে আমার হৃদয়কে পরিণত করো, কিন্তু না – তোমরাও তত কঠিন নও – তোমারাও দুর্বল হৃদয় – তোমরাও বিগলিত তুষার রূপ অশ্রুবারিবর্ষণ করে ক্ষীণতার পরিচয় দেও । জগতে আরো যদি কিছু কঠিনতম সামগ্রী

৩১। <u>The Plays of</u> Euripides. Vol.1(London,1928),Page-286.

থাকে — মোহ — রঙ্গ — তোমরা এসো ..." (১ম অঙ্ক / ২য় গর্ভাঙ্ক) এই বিলাপে যেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের সাজাহানের বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। যথা", এতদূর ? এতদূর ! — (গম্ভীর স্বরে) যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি তার সর্বস্ব ছেয়েছে, তবে আর কে ? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না। এই ক্ষণে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো।" (সাজাহান, ২য় অঙ্ক/ ৩য় দৃশ্য)। প্রথম অঙ্কেই লক্ষ্মণসিংহের চরিত্র সম্পূর্ণ হয়েছে এর পরে তাঁর চরিত্রের আর বিবর্তন নেই। বিবর্তন না থাকলেও মহিষী ও বিজয়সিংহের প্রতি মিথ্যাভাষণের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রে যেমন হীনতা প্রবেশ করেছে তেমনি অসহায়তাও মূর্ত হয়ে উঠেছে। সরোজিনীর কাতর উক্তি যেন তাঁর সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ বাণ বিদ্ধ করছে। সহ্য করতে না পেরে তিনি বলে উঠেছেন ,'আমি তো একেই উন্মত্তপ্রায় হয়েছি তাতে আবার মহিষীর গঞ্জনাও সরোজিনীর অটল ভক্তি , ওঃ — আর সহ্য হয় না' (৪র্থ অঙ্ক / ১ম গর্ভাঙ্ক)। পঞ্চম অঙ্কে চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে বলিদানের পূর্বে লক্ষ্মণসিংহের আভিজাত্য, মর্যাদা, ক্ষমতার গর্ব সর্ব কিছু ভেসে গিয়ে পিতৃত্বের দুর্বার স্নেহ ব্যর্থ ক্রন্দনে হাহাকার করে উঠেছে। তিনি বলে উঠেছেন, "না মা আমি তোমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে পারব না। বৎসে ! তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, যদিও আমি তোমার পিতানামের যোগ্য নই।" (৫ম অঙ্ক /৩য় গর্ভাঙ্ক) লক্ষ্মণসিংহের ট্র্যাজেডি চরম আকার ধারণ করেছে যখন রণধীর সিংহ ক্রোধান্বিত রাজার চক্ষু বন্ধন করেছে। লক্ষ্মণসিংহ আত্মস্বীকৃতিতে বলেছেন — 'রণধীর ! আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে।" ৫ম অঙ্ক /৩য় গর্ভাঙ্ক) লক্ষ্মণসিংহের পিতৃত্বই নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর রাজাত্ব ততো ফোটেনি। এখানেই আগামেমনন এর সঙ্গে লক্ষ্মণসিংহের পার্থক্য। আগামেমননের দৃঢ়তা, গ্রীসকে রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞা উপস্থিত বুদ্ধি লক্ষ্মণসিংহে নেই। আগামেমনন ইফিজেনিয়াকে স্পষ্ট করেই বলেছেন —

'In thee, my child,
What lies,and what in me, Greece
should be free,
Nor should her sons beneath
Barbarians bend.' 32

৩২। The Plays of Euripides. Vol.1(London,1928),Page-322.

চরম মুহূর্তেও তিনি লক্ষ্মণ সিংহের মতো ভেঙে পড়েন নি। ভৈরবাচার্যের কাণ্ডকারখানা যখন ফাঁস হয়ে পড়ল তখন লক্ষ্মণ সিংহ বলেছেন — 'কি আশ্চর্য! আমরা কি নির্বোধ, এতদিন আমরা এর বিন্দু — বিসর্গ ও টের পাই নি!' আমাদেরও একই প্রশ্ন? এতৎসত্ত্বেও লক্ষ্মণ সিংহ চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকারের ট্র্যাজিক চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহ চরিত্রটি সম্ভবত নাট্যকারের কাছে আদর্শস্থানীয় ছিল। ভীমসিংহ চরিত্রে দুর্বলতাই সব কিন্তু লক্ষ্মণ সিংহে কিছু সবলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহিষীকে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে হুকুম করেছেন, তাঁকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে সম্মত হন নি। বিজয়সিংহকেও তিনি অনুরূপভাবে বলেছেন, আমার পরিবারের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তাতে তোমার হস্তক্ষেপ করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। আমার কন্যার প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি না কেন, তোমার তাতে কথা কবার অধিকার নাই।' (৪র্থ অঙ্ক/ ১ম গর্ভাঙ্ক) রণধীরকেও তিনি বলেছেন, "যাও রণধীর! তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এখনই প্রস্থান করো। আমি থাকতে তোমার কর্তৃত্ব কিসের? আমি রাজা, তা কি তুমি জান না?" (৫ম অঙ্ক / ৩য় গর্ভাঙ্ক)। তাছাড়া তিনি একটি সিদ্ধান্ত ও নিয়েছিলেন যে সরোজিনীরা যদি অকুস্থলে আসে তাহলে তিনি বলিদানে বাধা দেবেন না। ভীম সিংহের চরিত্রে যে দুর্বলতা ও যন্ত্রনার অস্পষ্ট আভাস ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লক্ষ্মণসিংহের চরিত্রে তাকেই সুস্পষ্ট করে একটি পূর্ণাবয়ব মানুষ গড়ে তুলেছেন — জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে।

সরোজিনী চরিত্র সম্বন্ধেও এই কথা সত্য কারণ কৃষ্ণকুমারীর অনুসরণেই সরোজিনী অঙ্কিত হলেও কৃষ্ণকুমারীর তুলনায় সরোজিনী অনেক বেশী পরিণত। কৃষ্ণকুমারীর পরিণতিতে আদর্শবাদের ছায়াপাত আছে কিন্তু সরোজিনী যজ্ঞবেদির সামনে বসে ভৈরবাচার্যের খড়্গের আঘাত নিশ্চিত জেনে ক্রন্দন করে উঠেছে: 'মা, তুমি কোথায়? তোমার সঙ্গে কি আর এ জন্মে দেখা হবে না? আমার এই দশা দেখেও কি তুমি নিশ্চিন্ত আছ? কুমার বিজয় সিংহ? তুমিও কি জন্মের মত আমায় বিস্মৃত হলে? যদি কোনো অপরাধ করে থাকি তো মার্জনা করো। এই সময়ে একটিবার আমাকে দেখা দাও — আর আমি কিছু চাইনে।" (৫ম অঙ্ক / ৩য় গর্ভাঙ্ক)। এখানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরোজিনীর আত্মা ক্রমন করে তার মানুষী স্বরূপ অনাবৃত করে দেখিয়েছে। দেশরক্ষা, পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা, দৈববাণীর নির্দেশ কিছুই সরোজিনীর কাছে আর কোনো সান্ত্বনা বহন করে নি। কি রাজকুমারী কি ভিখারিণী, মৃত্যুর কঠিন স্পর্শে সকলেই তীব্র বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। একদিকে প্রিয়তম বিজয়সিংহ, স্নেহময়ী জননী, অন্যদিকে পিতা সরোজিনীর

দ্বন্দ্ব লক্ষ্মণসিংহের চেয়ে কম নয়।

সরোজিনী বিজয় সিংহকে যথার্থই বলেছেন, "না রাজকুমার! এই হতভাগিনীর জীবনসূত্রে বিধাতা আপনার সুখ - সৌভাগ্য বন্ধন করেন নি।" (৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক)। মাতাকেও সে বলেছে, "মা, আমার জন্যে তুমি কেন ভাবছ? আমার মরতে একটুও দুঃখ হবে না। আমি সুখে মরতে পারব।" কিন্তু তারপরেই কেঁদে বলে, "কেবল - তোমাকে যে আর এ জন্মে দেখতে পাব না, এই জন্যেই আমার..." (৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক) বিধাতা সরোজিনীর ভাগ্য নিয়ে নিষ্ঠুর তামাসা খেলেছেন আর সরোজিনী - বাত্যান্দোলিত লতার মত অনিবার্যবেগে পতনের দিকে ধাবিত হয়েছে।

'সরোজিনী' নাটকের অন্যচরিত্রগুলির তেমন বৈশিষ্ট্য ফুটতে পারে নি। ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্য তথা মহম্মদ আলির পিতৃত্বের ট্র্যাজেডি দেখানোর চেষ্টা আছে তবে মহম্মদ আলি মূলত খলচরিত্র বলে তার বেদনা আমাদের কাছে তেমন আবেদন সৃষ্টি করে না। তাছাড়া যেভাবে সে পরিচয় আত্মগোপন করেছিল তাও খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। ফতেউল্লা চরিত্রের মাধ্যমে হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস আছে। রসবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়োজনে চরিত্রটির উদ্ভাবন করা হয়েছে। সেদিক থেকে এরূপ গৌণ চরিত্রকে সমর্থন করা যেত কিন্তু তার গ্রাম্য সংলাপ ঐতিহাসিক নাটকের গাম্ভীর্য ক্ষুন্ন করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "সরোজিনী" নাটকটিকে তীব্র গতি সম্পন্ন করে তুলতে পেরেছেন। এই নাটকে বহির্দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব, দৈব দুর্বারতা এবং জাতি গর্ব সংমিশ্রিত হয়ে তীব্র বেগের সৃষ্টি করেছে। চিতোর ধ্বংসই নাটকের মূল বিষয়। কিন্তু নাট্যকার এই ঘটনাকে মানবিক স্বভাবের সঙ্গে অন্বিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে চিতোর নয়, লক্ষ্মণ সেনই ,রাজপুত পাঠান নয়, রাজপুত - রাজপুত দ্বন্দ্বই সমধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রথম থেকেই নাটকের গতি তীব্রতা ধারণ করেছে। লক্ষ্মণ সিংহের দেবীদর্শন, দৈববাণীশ্রবণ, ভৈরবাচার্যের দৈবাদেশের ব্যাখ্যা, লক্ষ্মণসিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা এবং সরোজিনীকে আনবার জন্য পত্রলিখন, আমাদের কৌতূহল, উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে তোলে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই বিশ্বস্ত পারিষদ রামদাসের কাছে রাজার আত্মস্বীকৃতি এবং সরোজিনীর আগমন লক্ষ্মণসিংহের সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। একথা সত্য যে নাটকে কুটিল ষড়যন্ত্রের রোমাঞ্চকর বিভীষিকা এবং করুণরসের আধিক্য রয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকে এ ধরণের ঘটনাসমাবেশ অসঙ্গত নয়। শেকসপীয়রের 'হেনরি দি সিকসথ' নাটকে এর চেয়েও নিষ্ঠুর ঘটনার সন্নিবেশ করা হয়েছে সেখানে 'ক্লিফোর্ড', বারো বছরের

বালক রুটল্যাণ্ডকে ছুরিমেরে হত্যা করেছে। এক পুত্র পিতাকে হত্যা করছে এক পিতা পুত্রকে বধ করছে, রাণী মার্গারেটকে পর্যন্ত হত্যা করার জন্য ডিউক অব ক্লারেন্স এগিয়ে গিয়েছেন। সরোজিনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি হওয়াই সঙ্গত ছিল। ট্র্যাজেডির মর্মান্তিক ভাগ্যবিপর্যয়ের বিষাদে ও দ্বন্দ্বে নাটকটি পরিপূর্ণ। সেদিক থেকে ষষ্ঠ অঙ্কটি আরোপিত বলে মনে হয়। সরোজিনীর উদ্ধার ও অনেকটাই অতিনাটকীয়। যেভাবে নাটকীয় দ্বন্দ্ব চরমোন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়েছিল তার অনিবার্য পরিণতি ছিল সরোজিনীর হত্যাসাধন। সে যাই হোক চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও 'সরোজিনী' নাটকে গতি রয়েছে এবং তা উৎকৃষ্ট নাট্যরসসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে এ সত্য অনস্বীকার্য।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসরণ না থাকলেও ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টিতে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের ধর্মীয় সংস্কার দৈববাণী, ভৈরবাচার্যের মন্ত্রোচ্চারণ, ভৈরবাচার্যের গণনা, যজ্ঞবেদি, বলিদানের নানাবিধ উপকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভৈরব যখন খড়্গ তুলে উদাত্তকণ্ঠে কালিকাবন্দনা করে আবৃত্তি করেন –

'জয় দেবি ভয়ঙ্করী নিখিল প্রলয়ঙ্করী
যক্ষ – রক্ষ – ডাকিনী – সঙ্গিনী'

তখন তো রীতিমত সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। ভৈরবাচার্যের গণনার ছলে হেঁয়ালি আবৃত্তি তুলনামূলকভাবে লঘুচপল। নাটকের শেষ দৃশ্যে জহরব্রত অনুষ্ঠান, সেখানে সর্বত্র চিতার অনলশিখা জ্বল জ্বল করে বাহুবিস্তার করছে। একটি বীরজাতির সতীত্বরক্ষার মর্মান্তিক প্রয়াস এখানে জীবন্তরূপলাভ করেছে। নাটকের আরম্ভ ও সমাপ্তি উভয় স্থানেই নাট্যকার মধ্যযুগের রহস্যময় পরিবেশকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছেন, এ কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসনীয়।

'অশ্রুমতী' (১৮৭৯)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সবচেয়ে দীর্ঘতম এবং বিতর্কমূলক নাট্যরচনা 'অশ্রুমতী'। 'অশ্রুমতী'কে প্রকৃতপক্ষে দুইটি বিচ্ছিন্ন নাটকের একত্র সমাবেশ বললেও ভুল হয় না। টড কথিত প্রতাপ সিংহের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং মৃত্যু নিয়ে একটি ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী অপরটি অশ্রুমতী এবং সেলিমের রোমান্টিক প্রণয় আখ্যান। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন,– "অশ্রুমতী নাটকখানি পড়িলেই বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে দুইটী কাহিনী দর্শকের মনকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাখে।"[৩৩] রাণা প্রতাপের কাহিনী এবং অশ্রুমতীর প্রেমের

৩৩। অজিতকুমার ঘোষ ঃ "বাংলা নাটকের ইতিহাস" (১৯৬৬) পৃঃ ১৪৪

কাহিনীর মধ্যে সাধর্ম্য কিছুই নেই। বরং প্রতাপসিংহের তীব্র তুর্কী বিদ্বেষ অশ্রুমতীর উদার প্রণয়ের দ্বারা সমালোচিতই হয়েছে নাকি ? – ১৩২৭ সালে প্রকাশিত 'অশ্রুমতী'র অষ্টম সংস্করণে গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ অংশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, "বলাবাহুল্য স্থল বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মানবপ্রকৃতির কিরূপ বিকাশ ও পরিণাম ঘটে তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য কার্য। কোনো মুসলমানের প্রতি হিন্দু ললনার অনুরাগের কথা শুনিয়া কেহ কেহ আঁৎকিয়া উঠেন। যেন এরূপ ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক, যেন এরূপ কেহ কখনও শুনে নাই, যেন ইতিপূর্বে কোনো উপন্যাসেই এরূপ ঘটনা বর্ণিত হয় নাই।"[৩৪] যদি নাট্যকারের এই উদ্দেশ্য প্রতিপাদন করা অভিপ্রেত ছিল তাহলে রাণাপ্রতাপের জীবনীকে প্রাধান্য না দিলেই সঙ্গত হত। 'রানা প্রতাপ সিংহের শুভ্র মন কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রুমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শমাত্র না থাকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি।'[৩৫] তাহলে লেখকের বক্তব্য অনুসারেই দেখা যাচ্ছে যে মানব প্রকৃতির বিকাশ ও পরিণাম নয়, রাণাপ্রতাপের অকলঙ্কিত যশ – খ্যাপনের – দিকেই তাঁর অধিকতর যত্ন ছিল। প্রকৃতপক্ষে অশ্রুমতীর যোগিনীর পরিণাম সেই লক্ষ্য থেকেই অঙ্কিত হয়েছে। 'অশ্রুমতী' নাটকরচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কবিমানস দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল সন্দেহ নাই। 'পুরুবিক্রম' নাটক প্রণয়নের কালের সেই উদ্দীপনা 'কি উপায়ে – দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হতে পারে।' – তা আর অক্ষুণ্ণ ছিল না। উদারতর মানবিকতার ধ্যানধারণা শিল্পীর চিত্তকে আন্দোলিত করছিল। যদিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকমধ্যে প্রেমের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণামকে শিল্পসফল করে তুলতে পারেন নি তথাপি সে হিন্দুপুনরুত্থান বাদের যুগে তিনি যে সাহস প্রদর্শন করে হিন্দুমুসলমানের প্রণয়কে বিবৃত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। রাণাপ্রতাপ যিনি হিন্দু রক্ষণশীল মনোভাবের মূর্ত প্রতীক তাঁরই কল্পিত কন্যার সঙ্গে – সেলিমের প্রণয় ও বিবাহের প্রস্তাব অবশ্যই দুঃসাহসিক কল্পনা। অশ্রুমতীর সেই বিখ্যাত উক্তি 'আমি রাজপুত্র ও জানিনে, মুসলমানও জানিনে – আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকে জানি' (৪র্থ অঙ্ক / ৮ম গর্ভাঙ্ক) সম্পূর্ণই নাট্যকারের অন্তরের কথা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। নামকরণ ও পরিণতির বিচারে 'অশ্রুমতী'র কাহিনীই নাটকের প্রধান অংশ বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শ অনুযায়ী 'অশ্রুমতী' রচনা করেছিলেন বলেই নাট্যকার নাটক মধ্যে প্রতাপসিংহের জীবনী সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

৩৪। সুশীল রায়, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" (১৯৬৩) পৃঃ ২১৭

৩৫। ঐ – পৃঃ ২১৭

প্রকৃত পক্ষে টডের রাজস্থানের প্রথম খণ্ডের 'অ্যানালস অব মেওয়ারের' দশম ও একাদশ অধ্যায়ের প্রতাপসিংহের কাহিনী নাট্যকার প্রায় অবিকৃতভাবে 'অশ্রুমতী' নাটকে গ্রহণ করেছেন। তথ্যানুগত্যের দিক থেকে 'সরোজিনী' নাটকের চেয়েও 'অশ্রুমতী' নাটকে নাট্যকার অধিকতর সতর্ক। টড বর্ণিত প্রধান ঘটনাগুলি তিনি অপরিবর্তিত রেখেছেন, অবশ্য অল্প স্বল্প পরিবর্তন যা করেছেন তা উল্লেখযোগ্য নয়। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজামানসিংহের আতিথ্যগ্রহণ ও অপমানে আতিথ্য প্রত্যাখ্যান সম্পূর্ণভাবেই মূলানুসারী। মনে হয় নাট্যকার যেন রাজস্থানের পাতা থেকে অনুবাদ করে পাত্রপাত্রীর মুখে সংলাপ যোগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে মন্ত্রীর উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। মন্ত্রী বলেছেন, "দেখো এই স্থান কলঙ্কিত হয়েছে - গঙ্গা জলের ছড়া দাও - এসো, আমরা সকলে স্নান করে পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে ফেলি।" টড বর্ণনা করেছেন,

'The ground was deemed impure where the feast was spread; it was broken up and lustrated with the water of the Ganges, and the Chiefs who witnessed the humiliation of one they deemed apastate, bathed and changed their vestments, as if polluted by his - presence.'[36]

এই দৃশ্যের শুধু নেপথ্যের উক্তি (সম্ভবত রাণা প্রতাপের) 'যে পক্ষে মোগল সম্রাট, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা ?' নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত। প্রতাপসিংহের আকস্মিকভাবে রাজসিংহাসনে আরোহন, শক্ত সিংহের সঙ্গে তাঁর কলহ, শক্ত সিংহের মেবার ত্যাগ, মোগল পক্ষে যোগদান, হলদিঘাটের যুদ্ধ, ঝালাপতি মান্নার প্রতাপের রাজছত্র গ্রহণ, মৃত্যুবরণ, শক্ত সিংহ কর্তৃক প্রতাপের অনুসরণকারী মোগল সৈনিকদ্বয় হত্যা, দুই ভ্রাতার মিলন, আরাবল্লীর গুহায় প্রতাপসিংহের সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ, ভীলদের সহযোগিতা, ফরিদ খাঁর জঙ্গলে জঙ্গলে অন্বেষণ, বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজের রাণাপ্রতাপের উৎসাহদান, 'হিন্দুর ভরসা আশা হিন্দুর উপর' প্রভৃতি বাক্যে পত্রলিখন, মন্ত্রী ভামশার রাণা প্রতাপের মেবারত্যাগের সংকল্প — প্রতিরোধ, আকবর কর্তৃক প্রতাপের আত্মত্যাগের প্রশংসা, পেষলা নদীর তীরে পর্ণকুটীরে প্রতাপসিংহের মৃত্যুবরণ, মৃত্যুর পূর্বে অমরসিংহের জন্য আক্ষেপ রাজপুত প্রধানদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতাপের নিশ্চিন্ত মৃত্যু প্রভৃতি

৩৬। J.Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol.I (London, 1957), Page -269.

ঘটনা প্রবহু 'রাজস্থান' থেকে নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র অক্ষুমতীকে নিয়ে রাণাপ্রতাপের দুশ্চিন্তা এবং মৃত্যুর পূর্বে তাকে যোগিনীব্রতে দীক্ষাদান, সম্পূর্ণ কালপনিক। 'রাজস্থানে' কথিত প্রতাপসিংহের জীবনবৃত্তান্তে অনেক আতিশয্য আছে সন্দেহ নেই এ বিষয়ে গবেষক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, 'আমরা বাল্যকাল হইতে যে সমস্ত কথা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি যথা, প্রতাপ ও শক্ত সিংহের বিরোধ, শক্ত সিংহের নির্বাসন, কুমার মানসিংহের অপমান, খোরাসানী মুলতানীকা অগগল, বীর শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষা, ভীলদের আশ্রয়ে সপরিবারে প্রতাপের গিরিগুহায় বাস, দারিদ্র্য পীড়িত ভগ্নহৃদয় প্রতাপের মেবার ত্যাগের সঙ্কলপ, চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রতাপের সন্ন্যাসব্রত ও শপথ ইত্যাদি সেকালের ভাটচারণের কলপনামূলক কাব্য নাটকের মনোরম শাখাপল্লব বলিয়া এখন আমাদের সন্দেহ হয়। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ অশুদ্ধ হইলেও রাম মিথ্যা হইতে পারে না, মহাভারত কাব্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হয়তো কালপনিক নহেন। মহামতি টডের 'রাজস্থান' ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপের বীরত্ব, স্বদেশাভিমান, ও স্বাধীনতার উপাসনা সীমাহীনি কলপনা প্রসুরের সুদূর আলেয়া ভ্রান্তি নহে।[৩৭]

আবুলফজল রচিত 'আকবরনামা' গ্রন্থে প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে যা লিখিত আছে তা ইতিহাস বলে গ্রহণ করলে রাজস্থানের অনেক ঘটনাকেই মিথ্য বলে বর্জন করতে হয়। 'আকবরনামা' তে বিবৃত আছে, 'The Rana came to welcome them, and received him with respect and put on the Royal Khilat. He brought Man Singh to his house as guest, but owing to his evil nature he proceeded to make excuses (about going to Court), alleging that his well-wishers would not suffer him to go. He made promises about going to the sublime court, but raised objections, and gave Man Singh leave to depart, while he himself stayed and procrastinated." Akbarnama, iii, 57).

৩৭। কালিকারঞ্জন কানুনগো ও "রাজস্থান কাহিনী," (১৩৭২) পৃষ্ঠ ২

৩৮। ঐ ঐ পৃষ্ঠ ৮

অতএব 'অশ্রুমতী'র প্রথম গর্ভাঙ্কের ঘটনাটিই সত্য কিনা তা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'রাজস্থান'কে ইতিহাস বলেই গ্রহণ করেছিলেন তার সত্যাসত্য বিচারের মধ্যে যান নি। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করে দেখিয়েছি যে 'রাজস্থান'কে প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না। অতএব 'অশ্রুমতী'তে বর্ণিত রাণা প্রতাপের কাহিনীভিত্তিক নাট্যাংশকে ও ইতিহাসাশ্রিতই বলতে হয়। পুরোপুরি ঐতিহাসিক বলা যায় না। তাছাড়া এই অংশের নাটকীয় বৈশিষ্ট্যও নেই বললেই চলে। স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতাপের তেজ, দর্প, পৌরুষ কেবলমাত্র সংলাপের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। ঘটনার সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষজাত উৎকণ্ঠা নেই বললেই চলে। প্রথম অঙ্কের সপ্তম গর্ভাঙ্কে হলদিঘাটের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। এই যুদ্ধ বর্ণনায় সেলিম নেই, সেলিমকে আক্রমনের মধ্য দিয়ে প্রতাপের যোদ্ধৃরূপ উদঘাটিত হত কিন্তু পৃথ্বীরাজের বিবৃতির মাধ্যমে বর্ণনা করবার ফলে নাটকীয় রস ক্ষুণ্ণ হয়ে গিয়েছে। পৃথ্বীরাজ বলেছেন, রাজপুতেরা পরাজিত বটে, কিন্তু এমন বীরত্ব কেউ কখন দেখে নি। ... আর প্রতাপসিংহের কি বীরত্ব তিনি মানসিংহকে খুঁজে না পেয়ে তলবারের দ্বারা পথ পরিষ্কার করে যেখানে সেলিম নেতৃত্ব করছিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সেইখানে উপস্থিত হলেন সেলিমের রক্ষকগণকে সহস্রে নিহত করে – সেলিমের উপর বর্শা চালনা করলেন – কিন্তু সেলিমের হাওদা লোহার পাড়ে সুরক্ষিত ছিল বলে, সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন,' (১ম অঙ্ক / ৭ম গর্ভাঙ্ক) এর পূর্বে প্রতাপসিংহের যুদ্ধের আস্ফালন প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হয়েছে বটে কিন্তু শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন রাণা প্রতাপের এরূপ মূর্তি প্রত্যক্ষ করতে পারলে দর্শকচিত্তে যে উত্তেজনা, আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা, ক্রোধ জাগত তা এখানে জাগে না। প্রথম দৃশ্যে মানসিংহের অপমানিত হওয়ার পরে তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগ এবং অপর দিকে রাজপুত জাতির আত্মরক্ষার প্রস্তুতি বর্ণনার মাধ্যমে সুন্দর নাট্যরস সৃষ্টি হতে পারত। 'পুরুবিক্রম' নাটকে নাট্যকার এরূপ নাট্যমুহূর্ত সফলতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু এখানে তিনি তানা করে গ্রামবাসীদের দিয়ে প্রতাপের সিংহাসন আরোহনের অতীত ইতিহাস রোমনথনে নিযুক্ত হয়েছেন। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে আসন্ন যুদ্ধে ত্যাগ স্বীকারের জন্য মহিষীর বীরত্বব্যঞ্জক উক্তির পরিবর্তে আমরা কন্যাদায়গ্রস্ত মাতার মত তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাই, "যুদ্ধের সময়কার কি দশা হয় বলতে পারা যায় না – মেয়েটির বিবাহ দেখে যেতে পাল্লেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।" প্রকৃতপক্ষে, নাটকে প্রতাপের জীবনী যতটা পাওয়া যায় ততটা নাটক পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনের সমুদায় ঘটনার মধ্যে বাছাই করে একটি অখণ্ড নাটকীয় তাৎপর্য আবিষ্কার করার প্রয়াস নাট্যকার করেননি। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'প্রতাপসিংহ' নাটকে ও

প্রতাপ চরিত্র অঙ্কনে অনুরূপ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন ।

তুলনামূলকভাবে 'অশ্রুমতী'র কাল্পনিক কাহিনীটি কিছুটা অতিনাটকীয় প্রবণতা সত্ত্বেও নাট্যলক্ষণাক্রান্ত হয়েছে । নাট্যকার নিজেই 'অশ্রুমতী' কাহিনীর উৎস সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন "রাণা প্রতাপ সিংহের একটি কন্যা আরাবল্লি পর্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টিন খনির মধ্যে হারাইয়া যায় এবং তত্রত্য ভীলগণ কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হয় ।এইটুকুই ইহার ঐতিহাসিক কিংবা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি । বাকী সমস্তই কপোলকল্পিত । অশ্রুমতী নামও মৎ প্রদত্ত ।"[৩৯] কিন্তু টডের রাজস্থানে বিশেষ করে প্রতাপসিংহের একটি কন্যার হারানোর কথা নেই । সেখানে আছে, 'On one occasion they were saved by the faithful Bhils of Cavah, who carried them in wicken baskets and concealed them in the tin mines of Jawura,where they guarded and fed them. Bolts and rings are still preserved in the trees about Jawura and chaond, to which baskets were suspended the only cradles of the royal children of Mewar in order to preserve them from the tiger and the wolf.'[40]

প্রতাপের সব ছেলেমেয়ের হারানোর কথাই আছে তার থেকে নাট্যকার একটি কন্যাকে বেছে নিয়েছেন । 'অশ্রুমতী'র সমস্ত আখ্যানটাই আগাগোড়া বানানো । প্রতাপের কন্যা রূপে অশ্রুমতী, আকবরের পুত্ররূপে সেলিম, প্রতাপের ভ্রাতারূপে শক্ত সিংহ, বিকানীরের রাজকুমার ও কবিরূপে পৃথ্বীরাজ, মোগল সৈনিক রূপে ফরিদ খাঁ এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মোগল সেনাপতিরূপে মানসিংহ, এঁদের সকলকেই এ কাহিনীতে ভুলতে হবে । ইতিহাসের সেলিম, মানসিংহ প্রভৃতির স্থলে নাট্যকারের কল্পিত কতগুলি চরিত্র নাটকের রঙ্গমঞ্চে ঘুরে বেড়ায় । ইতিহাসের সঙ্গে এঁদের কোনো সম্পর্ক নেই । ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, "অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর নাম এবং পারিপার্শ্বিক ব্যাপার ইতিহাস হইতে গৃহীত বটে কিন্তু ঘটনাসংস্থান সম্পূর্ণ কাল্পনিক ।তাই সেলিম ও অন্যান্য ভূমিকায় ইতিহাসের অনুসরণ না থাকায় দোষের হয় নাই ।"[৪১]

৩৯। সুশীল রায় — 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) পৃঃ ২১৭

৪০। J.Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan. Vol.1(London),1957), Page 272.

৪১। সুকুমার সেন — 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৩৭০) পৃঃ ২৯৭

প্রতাপের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য মানসিংহ অশ্রুমতীকে অপহরণ করে মুসলমানের সঙ্গে তার বিবাহ প্রদানের ষড়যন্ত্র করেন। এই ষড়যন্ত্রের সহায়ক হয় সামান্য সেনানায়ক ফরিদ খাঁ। নাটকের প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে মানসিংহের এই ষড়যন্ত্রের অবতারণা সুন্দর নাট্যিক উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে। মানসিংহ যখন মনে মনে সংকল্প প্রকাশ করেন বলেন 'যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, সূর্য – বংশীয় রাণা তার সঙ্গে কখনোই একত্র আহারস্থানে উপবেশন করতে পারে না' – কি দর্প কি অহংকার। প্রতাপের এ দর্প আমার চূর্ণ করতেই হবে।' তখন দর্শক ও পাঠকচিত্তে অদম্য কৌতূহল জন্মে। সত্যি সত্যি মানসিংহের অভিপ্রায় সার্থক হতে পারবে কিনা জানবার জন্য প্রতীক্ষা জাগে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে অশ্রুমতী খাটিয়া সহ অপহরণের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যিক গতি দ্রুততালে অগ্রসর হতে থাকে। অশ্রুমতীকে ঘিরে ফরিদের কল্পনা ভালো করে দানা বেঁধে উঠতে না উঠতেই সেলিমের প্রবেশ ও ত্রাণ কর্তার ভূমিকা গ্রহণ ঘটনাপ্রবাহে নূতন আবর্তের সৃষ্টি করে। তারপরে সেলিমের মধ্যে ঈর্ষা ও বিশ্বাসের যে দোদুল্যমান চিত্তবৃত্তি দেখানো হয়েছে তা সুন্দর নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। ফরিদ যথার্থ খলচরিত্রের ভূমিকায়, অবতীর্ণ হয়েছে। তাকে কেউ সন্দেহ করে নি। তবে ফরিদের খলতায় ইয়াগোর মত সূক্ষ্মতা নেই। শক্ত সিংহ, পৃথ্বীরাজ সেলিম এরা তিনজনেই অতিরিক্ত সরল। অশ্রুমতীকে সন্দেহ করে সেলিমের কার্যকলাপ অতিনাটকীয়, অশ্রুমতীর সুস্থ হওয়াও চমকপ্রদ, শেষদৃশ্যে শ্মশানে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎকার তো যাত্রা সুলভ। মোটকথা, অশ্রুমতীর কাহিনীতে নাট্যিক আবেদন থাকলেও সূক্ষ্মকাজ সেখানেও নেই। অশ্রুমতী সরল সেলিম উদার, ফরিদ খাঁ কুচক্রী, পৃথ্বীরাজ ব্যক্তিত্বহীন, সর্বত্রই অতি সরলীকরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অশ্রুমতী এবং সেলিম উভয়ের প্রায়ই আবেগ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ, ওথেলো দেসদিমনার গভীরতা সেখানে কোথায়?

ফরিদ খাঁর চরিত্রই সজীবতা লাভ করেছে। অশ্রুমতীকে কেন্দ্র করে তার রূপলালসা স্বাভাবিক। সেলিমের প্রতি ঈর্ষা হওয়া তার পক্ষে অসঙ্গত নয়। সে নিজেই বলেছে, "ফরিদ খাঁর মুখে গ্রাস কেড়ে নেওয়া বড়ো সহজ নয়।" (৩য় অঙ্ক / ৪র্থ গর্ভাঙ্ক) অশ্রুমতীর প্রতি তার ভালোবাসা নেই, কেবলমাত্র রূপলালসা, তাই তার চিত্তে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে তার অভিপ্রায় পাছে ধরা পড়ে যায় এ বিষয়ে একটু চেতনা থাকলে চরিত্রটি আরো বিশ্বাসযোগ্য হত। তার হত্যাসাধন ও চরিত্রোপযোগী হয়নি। তাঁর মত ধূর্ত লোক সময় বুঝে সরে পড়েছে এরূপ পরিণতিই যথার্থ হত। ভীলপতি বৃদ্ধ মল্লুচরিত্র একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে তবে তার চরিত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয় নি।

স্বপ্নময়ী (১৮৮২)

বাঙলাদেশের এক স্বলপখ্যাত ইতিহাস নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নময়ী নাটক রচনা করেন । ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে বাঙলাদেশে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে চিতুয়া বরদার তালুকদার শোভাসিংহ বিদ্রোহ করেন । তার সঙ্গে যোগ দেয় পাঠান সর্দার রহিম খাঁ । বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম তাকে বাধা দিতে গিয়ে যুদ্ধে নিহত হন, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে । তাঁর স্ত্রীকন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ ও প্রচুর ধনসম্পত্তি সহ বর্দ্ধমান – শোভাসিংহের হস্তগত হয় । রাজা কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জগৎরায় ঢাকায় গিয়ে নবাব ইব্রাহিম খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন । হুগলীর পশ্চিমবঙ্গের ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে নবাব শোভাসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন কিন্তু ১৬৯৬ খৃঃ ২২শে জুলাই শোভা সিংহ হুগলী লুণ্ঠন করলে নুরুল্লা পলায়ন করে । অতঃপর চুঁচুড়ার ডাচগণ শোভাসিংহকে বিতাড়িত করলে বিদ্রোহীরা গঙ্গার পশ্চিমতীরে চন্দন নগরের সীমা পর্যন্ত লুণ্ঠন করে । হুগলী থেকে বিতাড়িত করলে শোভাসিংহ রহিম খাঁর উপর দলের নেতৃত্ব দিয়ে বর্দ্ধমান গমন করেন । তথায় রাজা কৃষ্ণরামের দুহিতার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে তেজস্বিনী রাজকুমারী সত্যবতী ছুরিকাঘাতে শোভাসিংহকে বধ করে স্বয়ং আত্মঘাতিনী হন । শোভাসিংহের পুত্র হিম্মৎসিং অকর্মণ্য বিবেচনায় বিদ্রোহীরা রহিম খাঁকে নেতা নির্বাচিত করে লুণ্ঠন করতে করতে নদীয়ার পথে মুর্শিদাবাদে পৌঁছায় । মোগল জায়গীরদার নিয়ামত খাঁ বিদ্রোহীদিগকে বাধা দিতে গিয়ে নেও তার ভ্রাতুষ্পুত্র নিহত হয় । মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করে বিদ্রোহীরা গ্রামাঞ্চল সমূহ লুণ্ঠন করতে করতে ক্রমে রাজমহল ও ১৬৯৭ খৃঃ মার্চ মাসে মালদহ অধিকার করে । ঔরঙ্গজীব সংবাদ পেয়ে ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করেন । ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ বাদসাহী ফৌজ নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করল । তখন রহিম খাঁ ও হিম্মৎসিং গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভগবান গোলায় শিবির স্থাপন করে তথায় অবস্থান করছিল । জবরদস্ত খাঁ তাদের আক্রমণ করে দুইদিন ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ পরাজিত করল । বাদসাহী ফৌজ রাজমহল ও মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান অধিকার করে হিম্মৎসিং ও রহিম কে চন্দ্রকোণার জঙ্গলে তাড়িয়ে দিল । জবরদস্ত খাঁ পদত্যাগ করলে বিদ্রোহীরা পুনরায় নদীয়া হুগলী অঞ্চল লুণ্ঠন করতে করতে বর্দ্ধমানের নিকটবর্তী হল এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা আনোয়ারকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে হত্যা করে । তখন হামিদ খাঁ ও কোরেসীর বাদসাহী সেনা চন্দ্রকোনার নিকটে বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে ও রহিম খাঁর শিরচ্ছেদ করে । অতঃপর নেতার অভাবে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় । এইভাবে শোভাসিংহের

বিদ্রোহের অবসান হয় ।[৪২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে শোভাসিংহের বিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত ঘটনা গ্রহণ করেননি । সঙ্গত কারণেই তিনি শোভাসিংহের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা আশ্রয় করেছেন ।তাতে ঘটনা ও ভাব ঐক্য অক্ষুন্ন থাকতে পেরেছে । শোভাসিংহের বিদ্রোহ ক্ষুদ্র হলেও তাতে নাটকীয়তা আছে । অতএব এ কাহিনী গ্রহণ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যিক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন । তবে তাঁর অন্যান্য নাটকের মতো এখানেও তিনি ইতিহাসের ঘটনা ও ভাবকে নানাভাবে পরিবর্তন করেছেন । 'স্বপ্নময়ী' নামকরণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এ নাটকে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ইতিহাসকে নয় কল্পনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । বর্দ্ধমান রাজ কৃষ্ণরামের কন্যার নাম ছিল সত্যবতী , নাট্যকার তাঁকে স্বপ্নময়ীতে রূপান্তরিত করেছেন । ইতিহাসে সত্যবতীকে তেজস্বিনী বীররমনীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । তিনি সতীত্বরক্ষা করবার জন্য শোভাসিংহকে হত্যা করে নিজেও মৃত্যুবরণ করেন । নাটকে স্বপ্নময়ী সত্যিই উদাসিনী । সতীত্ব সম্বন্ধে, শ্লীলতা সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই । যখন তখন সে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, সেখানে খুশী সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে । শোভাসিংহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পিতার বিরোধিতা করেছে, শোভাসিংহকে ভালো বেসে , পরিশেষে ব্যর্থতায় উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছে । এইভাবে দেখা যায় যে নাটকের নায়িকাচরিত্র নামমাত্র ঐতিহাসিক । নাট্যকার সম্পূর্ণই তাকে নিজের মনোমত করে গড়েছেন । নায়কচরিত্র সম্বন্ধেও একথা সত্য । ইতিহাসের শোভাসিংহ নাটকে শুভসিংহ নাম পেয়েছে । শুভসিংহ স্বদেশপ্রেমিক । স্বদেশের হিতার্থে সে সুরজমল ও রহিমের চক্রান্তের অংশীদার হয়েছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিবেকের দংশনে সে অন্তরে স্বপ্নময়ীকে ঠিক ভালোবাসে, কৃষ্ণরামের ধনরত্ন সে দেশ জননীর সেবার জন্য দানপ্রার্থনা করে, কৃষ্ণরামকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে সে নিজে রক্ষা করে , তারপর নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে । ইতিহাসের বিদ্রোহী লুণ্ঠনকারী শোভাসিংহ এখানে কোথায় ? শোভাসিংহের বিদ্রোহ এবং পরিণাম কিছুই ইতিহাস সম্মত নয় । নাটকের শোভাসিংহ ঔরংজীবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সংঘবদ্ধ করবার ব্রতে দীক্ষিত হয়েছে । বর্ধমানের রাজার কোষাগার লুঠ করবার প্রস্তাব শোনামাত্র সে প্রতিবাদ করে উঠেছে । অতএব নাটকে - বিজ্ঞাপিত ঐতিহাসিক মূল ঘটনা ঃ শুভ সিংহের বিদ্রোহ নাটক মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে নি । কৃষ্ণরাম, তাঁর পুত্র জগৎ রায়, পাঠান সর্দার রহিম খাঁ কারো চরিত্রের সঙ্গেই ইতিহাসের

৪২। প্রভাসচন্দ্র সেন ঃ বাঙলার ইতিহাস । (১৩৭২) পৃষ্ঠ ৩৬৫ - ৩৬৬ দ্রষ্টব্য ।

যোগ সত্য হয়ে ওঠেনি। তাঁরা সকলেই নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। নাটকের অন্যতম মূলভাব ভারতবোধ যা শুভসিংহের 'অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন

একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতা মাতা।'

প্রভৃতি উক্তির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই ভারতবোধ নাটকের ঐতিহাসিক পরিবেশের পরিপন্থী। ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার প্রচারণা যুগোচিত যদি হয় এই ভারতপ্রীতি সম্পূর্ণ যুগবিরোধী ব্যাপার। কাজেই ঘটনা, চরিত্র, ভাবপরিবেশ রচনা কোনোদিক থেকেই 'স্বপ্নময়ী'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটকরূপেই স্বপ্নময়ীর শ্রেণী নির্দেশ করা সঙ্গত।

ডঃ সুশীল রায় বলেছেন, 'নাট্যগুণ ও রচনারীতির দিক থেকে স্বপ্নময়ীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়।'[৪৩] আমরা এমত সমর্থন যোগ্য মনে করি না। নাট্যগুণের বিচারে 'সরোজিনী'কেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্য্যাদা দিতে হয়। 'স্বপ্নময়ী' নাটকে কৃষ্ণ রাম ও শুভসিংহের দ্বন্দ্ব এই প্রধান ঘটনাটি রহিম খাঁর বাচালতা, স্বপ্নময়ীর প্রেম, শুভসিংহের দেবতা হয়ে যাওয়া, কৃষ্ণ রামের শান্তিপ্রিয়তা, জগৎরায় ও সুমতির বিচ্ছেদ প্রভৃতি অনেক অবান্তর ঘটনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। নাটকের ভাবকেন্দ্র স্পষ্টতা লাভ করেনি। গীতিকাব্যিক তারল্য নাটকের অবয়বকে দৃঢ় সংহতরূপ নিতে দেয়নি। নাটকের বিয়োগান্তক পরিণতি ও আকস্মিক ও চমকপ্রদ। নাটকের শেষদৃশ্যে সুমতি ও জগতের গান কাব্যিক কিন্তু ট্র্যাজিক নয়। নাটক হিসাবে 'স্বপ্নময়ী'র বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। তবে কাব্য হিসাবে 'স্বপ্নময়ী' স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে অরণ্য প্রদেশে স্বপ্নময়ীর ফুল তোলার গান, প্রত্যুত্তরে গোলাপের গান 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, ও সখি, আমারে জাগায়ো না।' অতি সুন্দর কল্পনা। যদিও গান দুইটি রবীন্দ্র-রচিত বলে অনুমান করা হয় কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারুণ গানের বিষয় নয় স্বপ্নময়ী গান করতে করতে ফুল তুলছেন এবং ফুলেরা উত্তর দিচ্ছে এই পরিকল্পনাটুকুই কাব্য মাধুর্যে ভরা এবং এই পরিকল্পনার কৃতিত্ব নিশ্চয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাপ্য। 'স্বপ্নময়ী'কে শুভসিংহের শিক্ষাদান কল্পে উপদেশ বাণী 'কে তোমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ ?

কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে ?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা ?
ধনধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার ?' (৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

৪৩। সুশীল রায় ও 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) পৃঃ ১৫৩

প্রভৃতি, স্বতন্ত্র কবিতা হিসাবে সুখপাঠ্য। শুভসিংহের 'দুর আকাশের তলে, ওই যে রতন-স্থলে / আনিতে কে যাবি তোরা / এই বেলা আয়রে "অতি সুন্দর চিত্রকল্প ভরা — কবিতা। নাটকের স্বপ্নময়ী চরিত্র, কবিত্বপূর্ণ কিছু সংলাপ এবং সংগীতের প্রাচুর্য নাটকটির আদ্যন্ত গীতিরসে পূর্ণ করে তুলেছে। শুভসিংহের চরিত্রে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের দ্বন্দ্বের সূক্ষ্মতাটুকু ও মূলত কাব্যিক। কিন্তু রহিম খাঁর বাচালতা, রাজাকৃষ্ণরামের শাস্ত্রানুগত্য এবং জনসাধারণের লৌকিক সংলাপ এই গীতিরসকেও নানাভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। সর্বোপরি জগৎরায় এবং জেহেনারা নির্লজ্জ লাম্পট্যের প্রত্যক্ষচিত্র নাটকের কোমল মধুর ভাবের উপরে কঠোর আঘাত হেনেছে। এগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত হলে 'স্বপ্নময়ী' কাব্যনাট্য হিসাবে উত্তীর্ণ হতে পারত।

চরিত্রচিত্রণে প্রথমেই শুভসিংহের চরিত্রের উল্লেখ করতে হয়। নাট্যকারের — সহানুভূতির স্পর্শে এই চরিত্রটি মোটামুটি সুঅঙ্কিত। নায়কোচিত গুণাবলীর অভাব তার চরিত্রে নেই। তবে নাট্যিক চরিত্র হিসাবে ত্রুটি হচ্ছে যে এই চরিত্রটির প্রকাশ আছে বিকাশ নেই। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে তার যে বিবেকদংশন তা নাটকের শেষ পর্যন্ত সমানে চলেছে। সুরজমলের হাতের ক্রীড়নক, ঘটনাকে নিজের আয়ত্তে আনবার কোনো চেষ্টা সে করে নি। একেবারে শেষে সে দেবতার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে, জগৎরায় এবং বাগদিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এখানেই তাকে সক্রিয়ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বলে এ প্রয়াস অতিনাট্যিক বলে মনে হয়। রাজা কৃষ্ণরামের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। তিনি বলেছেন, "শান্তি বিলাসী, সংসার অনভিজ্ঞ, স্নেহপরায়ণ রাজা কৃষ্ণরামের ভূমিকা খুবই মনোরম হইয়াছে, এই সরল, যুদ্ধবিমুখ অনুকম্প্য বৃদ্ধের বিরুদ্ধে যে হিংস্র বিদ্রোহ পুঞ্জীভূত হইয়া নির্মম আঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে তাহা অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক হইয়াছে।"[৪৪] কন্যার প্রতি তাঁর দুর্বলতা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এই মানবিক দুর্বলতার মাধ্যমে চরিত্রটি ইতিহাসের গণ্ডি পার হয়ে সাহিত্যের দরবারে স্থান পায়। তাঁর কাতরতা, "স্বপ্নময়ী, মা আমার কাঁদছিস? না, আমি তোকে কিছু বলিনি — তুই আমার দুধের বাছা, ননির পুতুলি — তোকে — অভিসম্পাত করে এমন কঠোর প্রাণকার? না না না। তুমি চাও মা? তুমি আমার শত্রু হয়ে এসেছ? তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে দাও মা।" (পঞ্চম অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক) আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। খলচরিত্ররূপে জেহেনা চরিত্র ও

৪৪। অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' (১৯৬৬) পৃঃ ১৪৭

সুঅঙ্কিত। এই নাটকে একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাই' উপন্যাসে রহিম খাঁর স্ত্রীরূপে লালবাই চরিত্র কল্পিত হয়েছে। এই নাটকে কয়েকটি জনতার দৃশ্য আছে। সেই দৃশ্যগুলিতে জনসাধারণের কুসংস্কার, অলৌকিকতায় বিশ্বাস, তাদের জীবনের তুচ্ছতা প্রভৃতি নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানব চরিত্রজ্ঞানের পরিচয় এখানে ভালোভাবে পাওয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক রচনার কৃতিত্ব এই যে তিনি ভারতেতিহাসের সুবিদিত ঘটনা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন। তাঁর পূর্বে প্রাণনাথ দত্ত 'সংযুক্তা স্বয়ম্বর' নাটক (১৮৬৭) রচনা করে ছিলেন কিন্তু এটিতে ইতিহাস বা নাটকীয় উৎকর্ষ নামমাত্র। সেতুলনায় 'পুরুবিক্রম' অনেক বেশী অগ্রসর রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাট্যরচনার প্রধান দোষ হচ্ছে যে তিনি নাটকমধ্যে অসঙ্গত ভাবে কাল্পনিক প্রেম ও প্রসঙ্গের বিস্তার ঘটিয়েছেন। মন্মথনাথ বসু মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু আদ্যন্ত কঠোর বীররস আশ্রয় করিয়া নাটক জমান কঠিন বিবেচনা করিয়া নাট্যকারগণ এই সকল নাটকে সুরচিত মধুর প্রণয়কাহিনী ঢুকাইয়া দিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল প্রণয়কাহিনীকে অতিরিক্ত রূপে রোমান্টিক করিতে গিয়া তাঁহারা ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' এই শ্রেণীর নাটকের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।"[৪৫] তাঁর নাটকের আরেকটি বহুকথিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি সমসাময়িক যুগচৈতন্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এ কাজটিও তাঁর পূর্বেই বাঙলা নাটকে শুরু হয়েছিল তবে তার সমৃদ্ধি ঘটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনীতে। দেশপ্রেম প্রচারের বাহন হিসাবে ঐতিহাসিক নাটককে গ্রহণ করার আদর্শের দোষগুণ যাই থাক পরবর্তীকালের বাঙলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এই আদর্শের জনয়িতারূপে চিরকাল স্বীকৃতি পাবেন। মহৎভাবের আবেগ সঞ্চার করে নাটকের পরিমণ্ডলকে উদ্দীপ্ত করে তুলবার প্রয়াসও প্রশংসনীয়। সংলাপ রচনায় চরিত্রোপযোগী ভাষার প্রয়োগ এবং উক্তির মধ্যে যথোচিত আবেগ সঞ্চার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যিক দক্ষতার পরিচায়ক। গিরিশ ঘোষের আবির্ভাবের ফলে তিনি যদি নাটকরচনা থেকে বিদায় না নিয়ে পরিণত প্রতিভাকে নাট্যরচনায় নিয়োজিত করতেন তাহলে তাঁর কাছে আমরা আরো সার্থক নাটক পেতে পারতাম এ আশা করা অন্যায় নয়।

৪৫। মন্মথমোহন বসু — "বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" (১৯৫৯) পৃঃ ৯৭–৯৮

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯ – ১৮৯৪)

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমকালে কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় নাটক রচনা করে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অধিকাংশ নাটকই পৌরাণিক বিষয়ঘটিত। তাঁর 'প্রহ্লাদচরিত্র' সেকালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বেঙ্গলথিয়েটারে ইহার অভিনয়ে দর্শকের ভিড় বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু ইতিবৃত্ত বিষয় নিয়েও তিনি কতিপয় নাটক রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে 'লৌহকারাগার' (১৮৮০) 'বনবীর' (১২৯৯) এবং 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি 'মীরাবাই' (১২৯৬) 'হরিদাস ঠাকুর' (১২৯৫) এই দুইটি ইতিহাসের চরিত্র নিয়েও নাটক রচনা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা ধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন করাই নাট্যকারের প্রধান অভিপ্রায় ছিল। 'মীরাবাই' নাটকে বর্ণনা করা হয়েছে যে আকবর চিতোর নগরের হরিমন্দিরে গিয়ে ছদ্মবেশে হরিভক্তদের সঙ্গে বসে মীরাবাই এর গান শুনেছেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তিনি চিতোরে বিগ্রহের কণ্ঠে মুক্তামালা পরিয়ে দেবার জন্য মীরাবাই কে দান করেন। এর থেকেই বোঝা যাবে যে রাজকৃষ্ণ রায় ইতিহাসকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন। হরিদাস ঠাকুর নাটকে হরিদাসকে ব্রহ্মার অবতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সমকালীন নবদ্বীপের কোনো তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় সে নাটকে ফুটে ওঠেনি। তাঁর তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকে ও ইতিহাসের কাল বা ইতিহাসের চরিত্র ফুটে ওঠে নি। উদাহরণ স্বরূপ 'বিক্রমাদিত্য' নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নাটক সম্পূর্ণ কিংবদন্তীর উপরে নির্ভর করে রচিত হয়েছে। দৈবশক্তির লীলাও মানুষী লীলা পাশাপাশি সঙ্ঘটিত হয়েছে। তাঁর 'লৌহ কারাগার' ও 'বনবীর' নাটক দুইটির বিশদ আলোচনা করে আমরা ইতিহাস বিষয়ক নাটক রচনায় রাজকৃষ্ণ রায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দেব।

'লৌহ কারাগার' (১৮৮০)

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লৌহকারাগার' নাটকটি চিতোরের রাণা সঙ্গসিংহ ও অম্বরের রাজা সূর্যসিংহের কলহ নিয়ে লিখিত। নাটকের পাত্রপাত্রী ও কয়েকটি স্থানের নাম ছাড়া আর কোথাও ইতিহাসের দেখা মেলে না। নাট্যকার নিজেও নাটকটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দেন নাই। 'বিয়োগমধ্যেপান্ত ও সংযোগান্ত' নাটক রূপেই নাটকটি পরিচয় দিয়েছেন।

বস্তুত নাটকের কাহিনী ও ঘটনাবিন্যাসে ইতিবৃত্তের চেয়ে রূপকথারই প্রভাব বেশী। চিতোরের রাণা সঙ্গসিংহের অধীনতা অস্বীকার করে অম্বুর অধিপতি সূর্যসিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তার ভাষায় 'ভাই, এ প্রাণ থাকিতে

আর না হইবে তাহা, যা হবার হল"।
এক্ষণে স্বাধীন আমি,' (১ম অঙ্ক /১ম দৃশ্য)

কিন্তু অচিরেই তার স্বাধীনতার সাধ চূর্ণ হল। সঙ্গ সিংহের সুযোগ্য সেনাপতি ও জামাতা ও বলসিংহ তার দুর্গ আক্রমণ করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করেন। তিনি ঘৃণাবশতই সূর্যসিংহকে নিহত করেন না, তাকে বন্দী করেন। তখন সূর্যসিংহ রাণার বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করতে স্বীকৃত হলে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু মুক্ত হয়ে তার সবসময় চিন্তা কিভাবে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা সেপূর্বে রাণা ও তাঁর জামাতাকে হত্যা করবার চেষ্টা করে বিফলমনোরথ হয়। এদিকে সিন্ধুরাজা রঘুদেব সিংহদেব প্রতাপগড় দুর্গ নিয়ে রাণা সঙ্গসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁকে দমন করবার জন্য বলসিংহ সসৈন্যে যাত্রা করেন। চিতোর অরক্ষিত থাকে। গুপ্তঘাতক সেই সংবাদ সূর্যসিংহের গোচরীভূত করলে সূর্যসিংহ আহ্লাদিত হয়ে কুমন্ত্রণা করে সরলরাণা সঙ্গসিংহকে পত্রদিয়ে জানালেন যে শিবরাত্রিব্রত দিবসে তারা রাণার নিকটে রাজকার্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করবার জন্য যাবে। রাণা যেন তাদের পূর্বের ঔদ্ধত্য মার্জনা করেন। রাণা সরলবিশ্বাসে তাদের আসতে বললেন। সূর্যসিংহ সৈন্যদের গুপ্তভাবে সজ্জিত করে চিতোরে পদার্পণ করে সঙ্গসিংহকে হত্যা করে তাঁর কন্যা বনলতাকে হরণ করে নিয়ে লৌহকারাগারে নিক্ষেপ করল। এরপরে প্রতি-শোধের পালা। পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নামক বলসিংহের জনৈক হিতৈষী ভুজসিংহকে খড়্গ দ্বারা বধ করল। আর বলসিংহ যুদ্ধপ্রত্যাগত হয়ে সমস্ত সংবাদ জানতে পেরে নগর আক্রমণ করে সূর্যসিংহকে পর্যুদস্ত করলেন। সূর্যসিংহ কিন্তু যুদ্ধ জয়ে উদ্যোগ না করে কারা-গারে গিয়ে বনলতাকে নিয়ে পালাবার উদ্যোগ করল। কিন্তু বনলতা তার সঙ্গে যেতে রাজী হল না। তখন সূর্য সিংহ করধৃত চন্দ্রহাস হাত থেকে খুলে বনলতার পা ধরে মিনতি করতে লাগল, "নারী তুমি, বুঝ না ত, তাই এ বিপদে

এরূপ রচনাবলী করিছ প্রয়োগ।
পায়ে ধরি, সুলোচনে অমূল্য জীবন
বিনষ্ট কর না — এস আমার শপথ।" (৫ম অঙ্ক / ৭ম দৃশ্য)

বনলতা সেই চন্দ্রহাস দিয়েই সূর্যসিংহের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে। সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে সূর্যসিংহ ভূলুণ্ঠিত হয়ে যন্ত্রণা সহকারে চিৎকার করতে থাকে। সেই সময়ে বলসিংহ প্রভৃতিরা কারাগারে প্রবেশ করে। সূর্যসিংহের সাধ্বী স্ত্রী জয়াবতী পূর্বে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে বনমধ্যে বিপদ গ্রস্থ বলসিংহকে রক্ষা করে তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে বলসিংহ যেন সূর্যসিংহের প্রাণবধ না করে। বলসিংহ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেও বনলতার আঘাতেই দুর্বৃত্ত সূর্যসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জয়াবতীও বক্ষে করাঘাত করে পতির অনুগামিনী হয়। তখন বলেন্দ্র ভয়ে হত্যাকাণ্ড স্মরণ করে বলে ওঠে – 'উঃ কি ভীষণ এই লৌহ কারাগার।' (৫ম অঙ্ক, পটপরিবর্তন, সপ্তম দৃশ্য)।

এই কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস ও নাটক উভয়েরই অভাব। রূপকথার বিষয়বস্তু নিয়ে যাত্রার আঙ্গিকে 'লৌহ কারাগার' লিখিত হয়েছে। নামকরণের যাথার্থ্য ও অনুভূত হয় না। লৌহকারাগারে একদিকে যেমন সূর্যসিংহ ও জয়াবতীর মৃত্যুতেও মিলন হয়েছে অন্যদিকে বলসিংহ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে এখানেই খুঁজে পেয়েছেন। কাজেই কারাগার ভীষণতার পরিবর্তে মিলনের পটভূমিকাই রচনা করেছে। নাটকের প্রথম দিকে সূর্যসিংহের খলতা নাটকে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে বেশ কৌতূহলের সঞ্চার করে। কিন্তু তারপরেই তার সহজ পরাজয় আমাদের প্রত্যাশা একেবারে নষ্ট করে দেয়। রাণা সঙ্গসিংহের অপমানের প্রতিশোধ নেবার যে সহজ পথ সে ও তার বন্ধু আবিষ্কার করে। তাতে নাট্যিক ঘটনার অগ্রগতি নামেমাত্রই হয়। সূর্যসিংহকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি বলেন্দ্রসিংহকে প্রাধান্য দেওয়া যেত তাহলেও সম্ভবত নাট্যিক বিষয়বস্তু কৌতূহলপ্রদ হতে পারত। জয়াবতীর স্বামীকে নিরস্ত করবার বিফল প্রচেষ্টা এবং বন্দিনী বনলতার আক্ষেপ গতানুগতিক বলে নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। চরিত্রসৃষ্টিও নাটকে সফলতা লাভ করে নি। বাঁধাধরা ঘটনার সাহায্যে কি ভাবে চরিত্রের বিকাশ সম্ভবপর? সূর্যসিংহ এবং বলেন্দ্রসিংহ চরিত্র দুইটির একজন মনুষ্যত্বহীন পিশাচ অন্যজন বীর উদার। তাঁদের চরিত্রে কোনো জটিলতা নেই, অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। নাটকের অধিকাংশ সংলাপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কিছু কিছু সংলাপে নাট্যকারের পদ্যরচনা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা –

(১) ভুজসিংহ – "আজ আনন্দ আপনি
তোমার মূর্তিতে, ভাই! মূর্তি মিশায়েছে।"

(৫ম অঙ্ক /১ম দৃশ্য)।

(২) মহালক্ষ্মী – "শুনি, মহারাজ
তব মুখে এই বাণী মহালক্ষ্মী আজি
লুকান রতন যেন পাইল আবার।" (২য় অঙ্ক ৯ম দৃশ্য)।

নাটকে অনেকগুলি সঙ্গীত যোজিত হয়েছে। সেগুলি প্রেম ও দেবতার স্তোত্র বিষয়ক। গতানুগতিক, বৈশিষ্ট্যবিহীন।

"লোহকারাগার" নাটকের উৎস হিসাবে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 'ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া রাজকৃষ্ণ প্রথম নাটক লিখিয়াছিলেন 'লোহকারাগার', বনোয়ারীলাল রায়ের 'জয়াবতী' কাব্য হইতে নাটকটির উপাদান গৃহীত*।' কিন্তু বনোয়ারি লাল রায়ের 'জয়াবতী' কাব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ক। সেখানে জয়াবতীকে চিতোর কন্যা বলা হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় – "রত্নসেন নামে হন চিতোরাধিপতি।
....
জয়াবতী নামে তাঁর কন্যা মনোরম।"
জয়াবতীর স্বামী সম্বন্ধেও বলা হয়েছে
"ফুলতান ভূপতির পুত্র জয়পালে।
করিলেন বাক্যদান সুখে এককালে॥"

দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন জয়াবতীর রূপ লাবণ্য শুনে তাকে পাবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। কবি বর্ণনা করেছেন, 'জয়া বিনা নাহি সুখ, হৃদয়ে উদয় দুখ,/ ভাবে কিসে হইবে মিলন॥' তিনি দূতমারফৎ চিতোরের রাণীকে পত্র দিয়ে লিখলেন, "আসিবেন কন্যা সহ দিল্লীতে ত্বরায়। হইবে উদ্বাহ কার্য ঈশ্বর কৃপায়॥" কিন্তু রত্নসেন সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে উত্তর দিলেন তাতে আলাউদ্দীন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করলেন ও যুদ্ধে রাজাকে বন্দী করলেন। জয়াবতী তখন যশলমীরে ভাবী স্বামী সকাশে যাত্রা করলেন। কিন্তু পথমধ্যে ঘোর দুর্যোগে পতিত হয়ে তিনি পাঠান সেনা পতির করে বন্দী হলেন। তিনি অঙ্গুরীয়তে লুকানো বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেনাপতি দেখতে পেয়ে তাকেড়ে নিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় হিন্দু সেনারা সেখানে এসে উপস্থিত হল পাঠান সৈন্য তাদের সঙ্গে না এঁটে উঠতে পেরে দিল্লীতে গিয়ে সম্রাটকে সব বৃত্তান্ত জানালে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বন্দীরাজাকে অত্যাচারে জর্জরিত করতে বললেন। এদিকে বনপ্রান্তরে জয়াবতীর সঙ্গে জয়পালের সাক্ষাৎ হল।

---

* সুকুমার সেন – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ১৩৭০ পৃঃ ৩৩৩

জয়পাল জয়াবতীকে যশলমীরে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি গোপনে দিল্লীতে ফকীরের বেশে রাজাকে উদ্ধারের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে যশলমীরে ফিরে গেলেন সেখানে সভাসদেরা মন্ত্রণা করে জয়পালের সঙ্গে জয়াবতীর বিবাহ দিলেন। তারপরে জয়াবতী এবং জয়পাল দুজনে ছদ্মবেশে কারাগারে এসে রত্নসেনকে উদ্ধার করে চিতোরে নিয়ে এলেন। সম্রাট আলাউদ্দীন এই সংবাদ শুনবার পর অপমানে দুঃখে মৃত্যুবরণ করলেন। " অনন্তর জয়পাল পুলকিত মনে।
চলিলেন জয়া - সহ নিজ নিকেতনে॥"

এই কাহিনীর সঙ্গে 'লোহকারাগার' নাটকের কোনোই সাদৃশ্য নেই। প্রকৃত পক্ষে 'লোহকারাগার' নাটকের কাহিনী নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত বলেই অনুমান করা যায়। এই নাটকটিকে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত কোনো আখ্যাতেই বিশেষিত করা যায় না।

বনবীর (১২৯৯)

টডের 'রাজস্থানের' অ্যানালস অব মেওয়ারের ১ম খণ্ডের নবম ও দশম অধ্যায়ে বিবৃত বিক্রমজিৎ ও বনবীরের কাহিনী অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ রায় এ নাটকটি রচনা করেন। ধাত্রী পান্নার সুমহান আত্মত্যাগের বিষয় নাটকে বিকৃত হলেও বনবীরের সিংহাসন প্রাপ্তি, তার অনুদ্বিগ্ন এবং পরিশেষে ক্ষমতাচ্যুতিই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু বলে নাটকের নামকরণ করা হয়েছে বনবীর। বনবীরই এ নাটকের নায়ক। তবে প্রথম দিকে জগমল, মাঝ থেকে উদয়সিংহ চরিত্র দুইটি ও বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। ধাত্রী পান্নার আত্মত্যাগ শোক ও কর্তব্যবুদ্ধি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। উৎসর্গপত্রে নাট্যকার ধাত্রীপান্নাকে সম্বোধন করে আবেগদীপ্ত ভাষায় লিখেছেন, 'পান্না, একদিন তুমি মানবী আকারে রাজধাত্রী ছিলে, এক্ষণে দেবী আকারে জগদ্ধাত্রী। তুমি হেন রাজধাত্রী, তুমি হেন জগদ্ধাত্রী যেভারতের, তোমার সেই ভারতেরই আমরা"। ইত্যাদি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নাট্যকার তাঁর লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। ধাত্রী পান্নার মহিমা নয়, বনবীরের জীবনকাহিনী নিয়েই তিনি নাটক রচনা করেন।

'লোহ কারাগারের' তুলনায় 'বনবীর' নাটক প্রণয়নে নাট্যকার অনেক বেশী উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের প্রথমে বিক্রমজিতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জগমল প্রভৃতি সর্দারদের বিদ্রোহ এবং জগমলেরই পিতা করমচাঁদের বিদ্রোহ নিবারণ করবার চেষ্টা সুন্দর নাট্যকৌতূহলের সৃষ্টি করে জগমলের দীপ্ত পৌরুষ বিক্রমজিতের সঙ্গে তর্কের মধ্য দিয়ে

তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জগমলকে যখন ক্ষমার কথা বলা হল তখন জগমলের চিৎকার "কি! ক্ষমা? বিনাপরাধে ক্ষমা? যে অপরাধী সেই ক্ষমাপ্রার্থী। আমি অপরাধী নই, ক্ষমাও চাই না।" (১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য)। বিক্রমের আচরণ ও নাটকীয় ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। তিনি সর্দারদের বিদ্রোহকে ষড়যন্ত্র বলে মনে করে বলেছেন, 'ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সবে,

মুখে মধু মনে হলাহল,
বাহ্য ভাবে বড়ই সরল,
কালকূটসম কূট অন্তরের স্তরে।' (১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য)।

জগমলের নেতৃত্বে সর্দারেরা পৃথ্বীরাজের পুত্র বনবীরের কাছে গিয়ে সমবেত হলেন। কিন্তু বনবীর প্রথমে তাদের নিরস্ত করবার জন্য বললেন,

'কাজ নাই রাজছত্র, রাজসিংহাসন,
কাজ নাই মহারাণা পরম উপাধি।
বেশ আছি, সুখে আছি,
কিসের অভাব মোর?
বিক্রমে আমাতে মিত্রভাব আছে চিরদিন,
থাকিবে ও-চিরদিন,' (১ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্য)

কিন্তু যখন সর্দাররা অন্যত্র লোক খুঁজবার জন্য যাত্রা করতে উদ্যত সেই সময়ে বনবীরের মাতা শীতলসেনা এসে পুত্রকে পরামর্শ দিলেন যে রাজা নয়, রাজ প্রতিনিধি হয়ে সে কিছুদিন সিংহাসনে অভিষিক্ত হোক। তখন বনবীর সর্দারদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে বলল — "ভাল, মাতা, তাই হবে।

রাজ-প্রতিনিধি হ'য়ে রাজ্য শাসি এবে।
হয় বিক্রমের, নয় উদয়ের
রাজ্য দিয়া আসিব ফিরিয়া।" (১ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্য)

এইভাবে নাটকীয় ঘটনা দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে লাগল। একদিকে করমচাঁদ বন্দী বিক্রম-জিতকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে থাকে অন্যদিকে জগমল উদয় এবং তার ধাত্রী পান্নার প্রতি অত্যাচার করতে থাকে। আর বনবীর রাজমুকুট লাভ করে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দীর্ণ হতে থাকে। "কি মোহিনী শক্তি ধরে রাজার ক্ষমতা।

কি কুহক রাজসিংহাসন!" (২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য —

বনবীরের মাতাও নিশ্চিন্ত থাকেন না । পুত্রের হৃদয়ে বিক্রমজিৎ এবং উদয়সিংহের হত্যার অনল জ্বালবার জন্য শিকরবলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে । শিকরবল সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বনবীরকে জ্যোতিষ গণনার দ্বারা বনবীরকে কুঅভিপ্রায় সাধনে উত্তেজিত করে । বনবীর রাত্রিবেলা কারাগারে গিয়ে নিদ্রিত বিক্রমজিৎকে হত্যা করে, ধাত্রী পান্নার নিদ্রিত শিশুকে উদয়সিংহভেবে নির্দয়ভাবে বধ করে । এই পর্যন্তই ঘটনার চরমোন্নয়ন । তারপরে ধাত্রীপান্না উদয়কে নিয়ে কমলমীরে আশাশাহের আশ্রয় নেয় । বনবীর মাতার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হতে থাকে । অবশেষে উদয়সিংহের দেখা পেয়ে তার ক্ষমা প্রার্থনা করে । সর্দাররাও সকলে মিলিত হয়ে বনবীরের স্থলে উদয়সিংহকেই মেওয়ারের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে 'জয় মিবারেশ্বর মহারাণা উদয় সিংহের জয় 'উচ্চারণ করে । নাটকের উপসংহার রচনায় নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি । বনবীর যত সহজে পাগল শিকরবলের কাছে তার মাতার কুটকৌশলের কথা জানতে পেরেছে এবং যত সহজে অনুতপ্ত হয়েছে তা নাটকোচিত হয়নি । নাটকের পরিণতিতে ও উদয়সিংহের সিংহাসনে অভিষেক বনবীরের সাক্ষাতে না হলে ভালো হত ।

তবে নাট্যকার এ নাটক প্রণয়নে টডের রাজস্থানকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করেছেন । বিক্রমজিতের অকর্মণ্যতা, সর্দারগণের বিদ্রোহ, বনবীরকে সিংহাসন প্রদান, ধাত্রীপান্নাকে হত্যা, পরিশেষে বনবীরকে সিংহাসনচ্যুত করা সমস্তই টডের গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয়েছে । বিক্রমজিতের স্বভাব সম্বন্ধে টড বলেছেন , **'Instead of appearing at their head, he passed his time amongst wrestless and prize fighters.' +**

নাটকেও আছে বিক্রমজিৎ বলেছে –'সর্দাররা নূতন মল্লপদাতিকদের ঘৃণা করেন ।' (১মঙ্ক ১ম দৃশ্য) ।টড উদয়সিংহকে ছয়বৎসরের বলে বর্ণনা করেছেন । নাটকে উদয় সিংহের কথা এবং আচরণ ছয় বৎসরের অধিক বলেই মনে হয় । উদয় সিংহ দাদার বন্দী হওয়ার সংবাদে আকুলতা প্রকাশ করেছে, জগমলকে সে চোখ রাঙিয়ে বলেছে 'রাজার ছেলেকে প্রজার আদেশ !' (২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য) ।

বনবীর চরিত্রের দ্বন্দ্ব অঙ্কনে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । বনবীরের নির্লোভমাতার দ্বন্দ্ব, অনুতাপ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে । এই চরিত্রটিতে যথার্থই ট্র্যাজিক চরিত্রের উপাদান নিহিত ছিল । ছদ্মবেশী শিকরবলের কাছে ভাগ্যগণনা শুনে বনবীরের উক্তি –

"একদিকে পদ্মের বচন ,
অন্যদিকে যোগীর বচন ,

+ J.Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan,Vol.1(London,1957)Page-248.

মধ্যস্থলে বনবীর ।
আর তিলমাত্র নাহিক সন্দেহ ।"
(২য় অঙ্ক / ৪র্থ দৃশ্য)

তার সুগভীর মর্মপীড়ার পরিচয় বহন করে । তাছাড়া বনবীর মূলত কোমল হৃদয়ের বলেই বিক্রমজিৎ এবং উদয়সিংহের হত্যাকাণ্ডে অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে । তার মাতা শীতলসেনীর চরিত্র ও নাট্যিক গুণান্বিত । তার রাজমাতা হবার আকাঙ্খা এবং সেই আকাঙ্খা পূরণের চেষ্টা আমাদের লেডী ম্যাকবেথের কথা মনে করিয়ে দেয় । লেডী ম্যাকবেথের মতোই তার পরিণতি ও বিয়োগান্তক । নাটকটি গদ্যপদ্য সংলাপে বিরচিত । যেখানেই নাট্যিক ঘটনা ও আবেগ সমুন্নতি লাভ করেছে সঙ্গতভাবে সেখানেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করা হয়েছে । তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ধাত্রী পান্না ও সাগর কথাবার্তা বলছে । পান্না সাগরকে বলেছে, 'তুমি এগোও, আমি যাচ্ছি । ভয় কোরো না , সাহস বুক বেঁধে চলে যাও ।' ইত্যাদি সেই সময়ে বেগে রক্তাক্ত বস্ত্রে ছোরাহস্তে বনবীরের প্রবেশ ও উক্তি "এ কি ! অন্ধকার গৃহ !

এই অন্ধকারে সর্পশিশু – দ্বিতীয় কণ্টক মোর "।

এখানে ধাত্রী পান্নার সহজ ভাষা বনবীরের মুখে কিছুতেই উপযুক্ত হত না । এইভাবে আলোচনা করে বলা যায় যে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বনবীর' ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক হিসাবে উল্লেখযোগ্যতার দাবী করতে পারে । ইতিহাসের বিষয় নিয়ে তিনি যতো নাটক লিখে – ছেন তার মধ্যে 'বনবীর'ই একমাত্র নাটক নামে গৃহীত হবার যোগ্য ।

<u>গিরিশচন্দ্র ঘোষ</u> (১৯০৫ খৃঃ এর পূর্বে রচিত ঐতিহাসিক নাটকাবলী)

গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকই রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে প্রণয়ন করেন । এ সম্বন্ধে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, 'গিরিশচন্দ্র বস্তুত ড্রামাটিস্টের চেয়ে প্লে – রাইট রূপেই বাঙলা নাট্যসাহিত্যে তথা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন ।"[৪৬] তিনি তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দরহো' (১৮৮১) সম্পূর্ণই ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যেই রচনা করেন । মহিলাকাব্য প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামির' নাটক প্রতাপচন্দ্র জহুরীর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয় ।

৪৬। রথীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'গিরিশরচনাবলী' (১৯৬৯) ১ম খণ্ড পৃঃ ১১

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে চারটি গান সংযোজিত করে নিজে হাম্বিরের চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নাটকাভিনয় দর্শকমহলে চলল না। কাজেই নিজেই লিখলেন ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দরহো'। এ নাটকটিও ভালো না চলাতে তিনি দীর্ঘকাল আর ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন নি। দর্শকদের মনোমত পৌরাণিক ও মহাপুরুষ চরিত বিষয়ক নাটক রচনাতেই আত্মনিয়োগ করেন।কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন 'ধর্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে।'[৪৭] পৌরাণিক নাট্যরচনার মাঝে মাঝে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার জন্য তিনি অনেকগুলি রোমান্টিক নাটক রচনা করেন। এই রকম কয়েকটি কল্পনাপ্রধান নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাসাশ্রিত। যথা 'চণ্ড' (১৮৯০) 'ভ্রান্তি' (১৯০২), 'সৎনাম' (১৯০৩)। যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক তিনি রচনা করেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পরে। 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬) 'মীরকাসিম' (১৯০৬) 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭)।এছাড়া 'রাণাপ্রতাপ' এবং 'ঝাঁসীর রাণী' নিয়ে তিনি দুটি অসমাপ্ত নাটক ও রচনা করেন। স্বদেশীযুগের দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত দর্শককুলের কথা মনে রেখেই তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়ণ করেন। কাজেই রঙ্গমঞ্চই ছিল গিরিশঘোষের সমস্যনাটক এবং বিশেষ করে ইতিহাসাশ্রিত ও ঐতিহাসিক নাটক রচনার মূল উৎস। একারণেই তাঁর এই শ্রেণীর নাটক ও সর্বদা দেশকালের ঊর্দ্ধে উঠতে পারে নি। ইতিহাসকে কল্পনার দ্বারা সজীব করে তার বস্তু সত্য ও ভাবসত্যকে উদঘাটিত করা নাট্যকারের প্রধান - উদ্দেশ্য ছিল না এরূপ বললে অসমীচীন হবে না। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে কোথাও কল্পনা কোথাও সমকালীন জাতীয়ভাবের প্রাধান্য বিস্তার করেছেন।এতৎসত্ত্বেও তাঁর জাতীয়ভাব প্রধান ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাসের বস্তুস্বরূপ অনেকটা অক্ষুণ্ন আছে। ঐতিহাসিক চরিত্রও সেখানে পরিস্ফুট হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটকরচনার জন্যই গিরিশঘোষ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এছাড়াও তিনি আরেকশ্রেণীর নাটক রচনা করেছিলেন, যেগুলিতে সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্রের আখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু সেগুলিকে কিছুতেই ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত নাটক বলা যায় না। যেমন 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৬) 'রূপসনাতন' (১৮৮৭) 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৮) 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) 'শঙ্করাচার্য' (১৯১০) প্রভৃতি। এগুলি আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত চরিত্রপ্রধান নাটকের অনুভুক্ত করাইবাঞ্ছনীয়। এ অধ্যায়ে আমরা গিরিশচন্দ্রের প্রধান পর্যায়ের ঐতিহাসিকনাটক সম্বন্ধে আলোচনা করব। 'আনন্দ রহো', 'চণ্ড', 'ভ্রান্তি', 'সৎনাম' এই চারটি নাটকেই

৪৭। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'নাট্যকার' (নাট্যমন্দির) ১ম বর্ষ, ১৩১৭

কল্পনার প্রাধান্য । একমাত্র 'চণ্ড' নাটকেই গিরিশ ঘোষ নিজে কল্পনার সমাবেশ করেন নি । কিন্তু সেকাজটি ভাট এবং চারণেরাই করে দিয়েছেন । টড 'রাজস্থানে' চণ্ডের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে ইতিহাসের চেয়ে কল্পনারই প্রাধান্য অবিসংবাদিত । কাজেই 'চণ্ডকে'ও ঐতিহাসিক নাটকরূপে আখ্যাত করা যায় না । 'সৎনামে' ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিমণ্ডল কিছুটা আছে । কিন্তু এর নায়িকা বৈষ্ণবী সম্পূর্ণ নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত । এখানে আদিরসাত্মক অতিনাটকীয় কাণ্ডকারখানা নাটকটির ঐতিহাসিক মর্যাদা অনেকাংশে নষ্ট করেছে । এই নাটকগুলিতে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকের দেশপ্রেমের কিছু কিছু আভাস আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এগুলি মূলত কল্পনা প্রধান ইতিহাসাশ্রিত নাটকরূপেই বিবেচিত হবে । সমকালীন দেশকালের সঙ্গে এগুলির যতোটা যোগ তার চেয়ে বেশী যোগ রোমান্স বা বিশুদ্ধকল্পনার সঙ্গে ।

'আনন্দ রহো' (১৮৮১) ।

আমরা পূর্বে বলেছি যে ঐতিহাসিক নাটককে প্রথমে নাটক হতে হবে । সে বিচারে 'আনন্দরহো' মোটেই নাট্যগুণান্বিত নয় । নাটকের প্রধান চরিত্ররূপে বেতাল বলে এক ব্যক্তির কল্পনা করা হয়েছে , সে গাঁজা খায় এবং সব সময় আনন্দ রহোবলে চীৎকার করে । এই ব্যক্তি সর্বশক্তিমান, আকবর একে নিজের গুপ্তচর ভাবেন, রাজপুতেরা ভাবেন সে দেশপ্রেমিক । সে প্রহরীদের গায়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে, প্রতাপের সৈন্যদের মধ্যে থেকে ছদ্মবেশে থেকে বিদ্রোহের প্রেরণা যোগায় । আকবরকে সে হুকুম করে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্য । আকবর সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালে সেখানে সে পা দেয় । কারাগারের গুপ্তঘরের চাবির সে সন্ধান জানে । গিরিশঘোষের অন্যান্য নাটকের ছদ্মবেশী মহাপুরুষ চরিত্রের মতো সেও একজন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ । সে শেষ পর্যন্ত মানসিংহ কর্তৃক আকবরকে বিষ দিয়ে জর্জরিত করবার কাজে সহায়তা করেছে । কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তার চরিত্র স্পষ্ট ও সজীব হয়ে ওঠে নি । রাণা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের সন্ধিসংক্রান্ত প্রস্তাব, মানসিংহকে হত্যা করতে আকবরের ষড়যন্ত্র, মানসিংহের কন্যা লহনার প্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ঘটনার মধ্যে কোনো ভাবৈক্য সংস্থাপিত হয় নি । নাটকের সংলাপও নিষ্প্রাণ । যথা 'মানসিংহ — রাজা মান সতর্ক , সাবধানের বিনাশ নাই, আকবরসা জান না, তোমার বিষপাত্র তোমারই মুখে ।' (৫ম অঙ্ক/ ৩য় গর্ভাঙ্ক।) টডের রাজস্থান গ্রন্থই এই নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি । টড বর্ণনা করেছেন, 'A desire to be rid of the great Raja

Maun of Amber,to whom he was so much indebted made the emperor descend to act the part of the assasin. He prepared a majoom, or confection, a part of which contained poison; but caught in his own snare,he presented the innoxious portion to the Rajpoot and ate that drugged with death himself.৪৮

প্রতাপ আকবরের যুদ্ধ, প্রতাপের মৃত্যু এবং মানসিংহের বিরুদ্ধে আকবরের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি টড থেকে নেওয়া। কিন্তু টডের রাজস্থানের অধিকাংশ তথ্যই যে ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত হয় না তা আমরা দেখিয়েছি। আকবরের মৃত্যু উদরাময় বা আমাশয়ে হয়েছিল। তার পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র নেই।[৪৯] অতএব ঐতিহাসিক তথ্য এবং নাটকীয় বৈশিষ্ট্য উভয়ের বিচারেই আনন্দ রহো কে কোনোই গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তথাপি গিরিশচন্দ্রের প্রথম ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকে তিনি ইতিহাসকে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন তা দেখাবার জন্যই আমরা নাটকটির আলোচনা করলাম।

চণ্ড (১৮৯০)।

টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের 'অ্যানালস অব মেওয়ারের' ৭ম অধ্যায়ে বর্ণিত চণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত হয়। লাক্ষরাণার রাঠোরাধিপতি রণমল্লের কন্যাকে বিবাহের বৃত্তান্ত নাটকের 'সূচনা' ও পরিশিষ্টের স্বল্প অংশে এবং নাটক মধ্যে কুশলার উক্তির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিবৃত হয়েছে। নাটকের শুরু হয়েছে – লাক্ষরাণার পুত্র মুকুলজীর পঞ্চমবৎসর প্রাপ্তির পরে। তারপরে বিশ্বস্তভাবে টডের অনুসরণে চণ্ডের বিরুদ্ধে রাণীর কার্যকলাপ, চণ্ডের মেবারত্যাগ এবং মান্ডুরাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ, রণমল্ল এবং তার পুত্র যোধরাও সদলবলে মেবারে আশ্রয় গ্রহণ, রণমল্লের মুকুলজীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মুকুলজীর ধাত্রীর সঙ্গে রাণীর পরামর্শ, চণ্ডের ভ্রাতা রঘুদেবের হত্যা, চণ্ডকে রাণীর সম্বাদ দেওয়া, চণ্ডের ভীল সৈন্য সহ আগমন, রাণীর গোসুন্দা নগরের দেয়ালী

৪৮। J.Tod,Annals and Antiquities of Rajasthan,Vol.1(London,1957), Page-279.

৪৯। 'He was attacked by severe diarrhoea,or dysentry in the autumn of 1605 and died on the 17th October."From,An Advanced History of India(London,1967),Page-450.

উৎসবে যোগদান, যুদ্ধে রাঠোর সৈন্যদের নিষ্ঠুরভাবে বধ করে মান্ডুর নগরে আশ্রিত যোধরাওয়ের পশ্চাদধাবনের সংকল্প প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে। রাজস্থানে আছে

"But Chonda's revenge was not yet satisfied. He pursued Rao Joda, who unable to oppose him, took refuge with Hurba Sankla leaving Mundore to its fate. This city Chonda entered by surprise, and holding it till his sons Kontotji and Munjaji arrived with reinforcements, the Rahtore treachery was repaid by their keeping possession of the capital during twelve years.'[50]

এই ঘটনাটুকু আর নাটকে গৃহীত হয়নি। তাতে নাটকের মূলভাব ক্ষুণ্ন হয় নি। চণ্ডের প্রতিবিধিৎসামূলক উক্তি – 'উল্লাসের দিন এবে নহে বন্ধুগণ,

নাহিক বিরাম যত দিন রাঠোরীয়
বংশ ধ্বংস নাহি হয়,' (৫ম অঙ্ক/৭ম গর্ভাঙ্ক)

– পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছে।

'রাজস্থান'কে ইতিহাস গ্রন্থ বিবেচনা করে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর বাঙলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থে এবং ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য গিরিশরচনাবলী সম্পাদনার ভূমিকায় চণ্ডকে সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রূপে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে 'চণ্ড'কে ইতিহাসাশ্রিত নাটকের শ্রেণীভুক্ত করাই সমীচীন। রূপমল্ল, খাণ্ডাধারী, বিজয়ী শিখণ্ডী প্রভৃতি চরিত্রের কার্যকলাপ রূপকথা ধরণের। বিজয়ীর প্রতি রূপমল্লের লালসা ও বিজয়ীর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঘটনার আভাস যদিও 'রাজস্থানে' আছে তথাপি নাট্যকার যে ভাবে তার বিস্তার ঘটিয়েছেন তাতে কল্পনারই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। শিখণ্ডীর মতো একটি প্রধান চরিত্রও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পূর্ণরাম ভাট Serio Comic – চরিত্র, নাট্যকক্রিয়ার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগও কম। এরূপ কাল্পনিক চরিত্র দোষের হয় নি।

নাটকটি মহৎভাবে পরিপূর্ণ। চণ্ডের আত্মত্যাগ, বিমাতার কাছে অবমাননা স্বীকার করেও নীরবে আত্মলোপ, ধাত্রী কুশলার বলিষ্ঠতা, রঘুদেবের আত্মত্যাগ, ভীলদের প্রভুভক্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। প্রথমদিকে বিজয়ীর রঘুদেব কামনা এবং তারপরে

৫০। J. Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol.1 (London, 1957), Page -226.

রূপমল্লের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা যদি কিছুটা সংক্ষিপ্ত হত তাহলে নাটকের ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি পেত । রঘুদেবের মাহাত্ম্যকীর্তনের মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকাপতন হওয়ার ফলে চণ্ডের বীরত্ব খানিকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে । চণ্ড চরিত্রের মানবিক দুর্বলতা নেই বলে চরিত্রটি আদর্শ প্রধান হয়ে পড়েছে । অন্যান্য চরিত্রেও জটিলতা নেই । সকলেই এক একটি ভাবের — প্রতিনিধি । তবে বীররস সৃষ্টিতে নাট্যকার প্রশংসার দাবী করতে পারেন । অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সংলাপ স্থানে স্থানে আবেগমণ্ডিত, ফলে সার্থক যথা গুল্মমালার ক্রোধপূর্ণ সংলাপ ঃ– 'জের মুক্তের ব্যঙ্গ যত চণ্ডের কৌশল ।

করেছিল ছল রাণা বুঝিতে চণ্ডের
মন, নহে চিতোর – ঈশ্বর মিথ্যাবাদী ?' (১ম অঙ্ক /১ম গর্ভাঙ্ক)

অথবা চণ্ডের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তিঃ 'দেহ রণ, বীরদর্পে কর আক্রমণ, –
ছিন্নভিন্ন হইবে এখনি, বৃক্ষপত্র
যথা ঘূর্ণবায়ে, বজ্র সম পড় শত্রু
মাঝে', ... (৪র্থ অঙ্ক /৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

<u>ভ্রান্তি (১৯০২)</u> ।

এই নাটকে যে ইতিবৃত্তি মূলক ঘটনা আছে তা রাজস্থানের নয় তা বাঙলাদেশের। এবং সে ঘটনাও খুব সুপরিচিত নয় । প্রভাস চন্দ্র সেনের 'বাঙলার ইতিহাস' গ্রন্থে – ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে । 'বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তর ও উত্তর – পশ্চিমে অবস্থিত সাঁওতাল পরগণার পাকুড় মহকুমায় রাজসাহী পরগণা অবস্থিত । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জমিদারগণ এই পরগণার মালিক ছিলেন । রাজসাহী পরগণার দেবী নগরে ইহাদের বাস ছিল । মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ঐ জমিদার বংশীয় উদয়নারায়ণ রায় রাজসাহী প্রভৃতি পরগণা ভোগ করিতেন । উদয়নারায়ণের কর্মদক্ষতায় মুর্শিদকুলী তাঁহার হস্তে পার্শ্ববর্তী ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার দেন । এই কার্যে তিনি কৃতকার্য হইবার পর তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন হইবার বাসনা জন্মে এবং দুর্গাদি নির্মাণ ও বলসঞ্চয় করিতে থাকেন । সুবাদার তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ফৌজ পাঠাইলে তৎসহ যুদ্ধে উদয়নারায়ণ পরাস্ত ও বন্দী হন [৫১]' কিন্তু নাটকে এই <u>ঐতিহাসিক ঘটনার কোনোই</u> প্রাধান্য নেই । নাট্যকার উদয়নারায়ণের –

৫১। প্রভাস চন্দ্র সেন – 'বাঙলার ইতিহাস' (১৩৭২) পৃষ্ঠ ৩৭৭ ।

বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে দেখিয়েছেন। রাজমহলের জমীদার শালিগ্রাম রায়ের পুত্র নিরঞ্জনের সঙ্গে উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরীর বিবাহ সব স্থির কিন্তু শেষে নিরঞ্জন পলায়ন করলে তাঁর সঙ্গে মাধুরীর আর বিবাহ হয় না। সেকারণে উদয়নারায়ণ শালিগ্রামের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করেন। তিনি নবাবের অনুমতি নিয়ে শালিগ্রামকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। শালিগ্রাম কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সরফরাজ খাঁর ইচ্ছানুযায়ী তার কাছে মাধুরীকে উপহার দেন। তখন উদয়নারায়ণ নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। উদয়নারায়ণের পরিণামও নাট্যকারের স্বকপোল-কল্পিত। মুরশিদকুলিখাঁর সামনেই উদয়নারায়ণ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মুরশিদ কুলিখাঁ অবাক হয়ে যান। বিস্ময় কমলে তিনি বলে ওঠেন ঃ 'তাজ্জব হ্যায়! তোম লোক আপনাকা দেওতাকা নামলেও।'(৫ম অঙ্ক ৯ম গর্ভাঙ্ক)। উদয়নারায়ণ, মুরশিদকুলি খাঁ সরফরাজ খাঁ, এই তিনটি ঐতিহাসিক চরিত্র নাটকে আছে। মুরশিদকুলি খাঁ উদার নৃপতি হিসাবে এবং সরফরাজ খাঁকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুবরাজ হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। এতে মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক সত্য অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু এই দুইটি প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র নাটকে মোটেই পরিস্ফুট হয়নি। উদয়নারায়ণ চরিত্র অবশ্য পরিস্ফুট হয়েছে বিস্তৃত ভাবে কিন্তু তাঁর চরিত্রে সঙ্গতি বলতে কিছু নেই। তিনি কখনো স্নেহ পরায়ণ পিতা কখনো অনুতপ্ত স্বামী, কখনো দাম্ভিক জমিদার, কখনো বিদ্রোহীবীর সবশেষে ভ্রান্তপরাজিত প্রেমিক। প্রকৃতপক্ষে উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ এবং পরাজয় নয় তাঁর কন্যা মাধুরী এবং তাঁর পালিতা কন্যা ললিতার প্রেম সঞ্চার এবং বিবাহ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনাই নাটকের বর্ণিতব্য বিষয়। এর সঙ্গে আরো অনেক উদ্ভট ঘটনায় আমদানি করা হয়েছে। ফলে ইতিবৃত্ত কোথায় দূরে সরে গিয়েছে। নাট্যকার নিজেও নাটকটি ইতিবৃত্ত মূলক বলে বিজ্ঞাপিত না করে 'ভ্রান্তিমূলক বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক' বলেই বিশেষিত করেছেন। নাটকটির সূচনা সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। ইতিবৃত্ত বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে আমদানি না করলে এটি একটি সুন্দর রোমান্টিক কমেডিতে রূপান্তরিত হতে পারত।

সৎনাম (১৯০৪)।

ঐতিহাসিক নাটকের উপাদানে 'সৎনাম' পরিপূর্ণ। নাট্যকার সবিশেষ আনুরিকতা নিয়ে এ নাটকের ইতিহাস ব্যবহার করেছেন। তিনি নাটকের ভূমিকাতে লিখেছিলেন, "সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। ইহারা ভগবানকে সৎনাম বলে এ নিমিত্ত ইহাদের নাম 'সৎনামী'। নাটকের ঐতিহাসিক অংশ কয়েকখানি

পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈক রাজপুতরমণী এই বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন। আমার ধারণায় ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস রচয়িতার কর্তব্য এই যে, তাঁহার রচিত পুস্তকে সাময়িক অবস্থা ও ঘটনার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হয়। ভিকটার হুগো, ডুমা ইউজিন সু সার ওয়ালটার স্কট প্রভৃতির গ্রন্থ এরূপ রচনার দৃষ্টান্ত স্থল। এ সম্বন্ধে অবশ্যই আমার ত্রুটি আছে, কিন্তু আমি তাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই।" নাটকটি ঐতিহাসিক নাটকরূপেই বিজ্ঞাপিত হয়েছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ২জন মুসলমান পাইক কর্তৃক একজন কৃষকের উপরে হামলার ঘটনা ইতিহাস অনুমোদিত। ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, 'These people came into conflict with the forces of Government from a purely temmporal cause. 'One day a Satnami cultivator near Narnol had a hot dispute with a foot soldier(Piada) who was watching a field, and the soldier broke the pesant's head with his thick stick. A party of Satnamis beat the assailant till he seemed dead."[52]

এরপরে সৎনামীদের দলবদ্ধ হয়ে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, বৈষ্ণবী নাম্নী একজন মহিলা নবীর আবির্ভাব, সৎনামীদের আন্দোলনের বিস্তার, মোগল সৈন্যদের বিধ্বস্ত করণ, পরিশেষে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধযাত্রা এবং সৎনামীদের দমন ও জিজিয়াকরের পুনঃ সংস্থাপন মোটামুটি ইতিহাস সম্মত। এলফিনস্টোনের ইতিহাসেও আওরঙ্গজেবের স্বয়ং যুদ্ধে আগমনের উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, "But the previous success had tempted many of the Hindu population to take up arms,and had thrown the whole provinces of Ajmir and Agra into such confusion that Aurangzib thought his own presence necessary to restore order." [53]

সৎনামী সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাদের অধিকাংশ কৃষকসম্প্রদায়ভুক্ত তারা ফকীরদের মত কাপড়চোপড় পরত, তারা সততা অবলম্বন করে নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী চলতে চাইত, কারো কাছ থেকে টাকা পয়সা লুণ্ঠন করত না। নাটকে সৎনামীদের এরূপভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু তাদের কৌমারী দেবীর উপাসকরূপে কল্পনা

৫২। J.Sarkar,A short History of Aurangzib(Calcutta,1930),Page -153.

৫৩। M.Eliphinstone,The History of India(London,1916),Page-620.

করা হয়েছে। তাতে মনে হয় ঐতিহাসিকতা ক্ষুন্ন হয়েছে কারণ সৎনামী সম্প্রদায় শাক্ত ধর্ম আশ্রিত ছিল না। ফকীরি যাদের অবলম্বন তাদের বৈষ্ণব হওয়াই সম্ভব। বৈষ্ণবী যার নাম তার মুখে 'কোমারীনন্দিনী আমি!

নেহার সঙ্গিনী -

কোমারীর অনুচরী ভীষণা যোগিনী' (২য় অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক) এমনিতেই বেমানান। সৎনামী সম্প্রদায় অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছিল বলেই তাদের রুধির পিপাসু রূপে অঙ্কিত করা সঙ্গত হয়নি। সৎনামীদের নেত্রী বৈষ্ণবী এবং নেতা রণেন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের শান্তি এবং ভবানন্দের কথা মনে করিয়ে দেয়। তীব্র সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ নাটকে অস্বাভাবিক হয় নি। সাম্প্রদায়িক আওরঙ্গজেবের বিরোধিতা করতে গেলে হিন্দুধর্মের জয়গান করতেই হবে। এসম্বন্ধে নাট্যকারের যুক্তি 'এই নাটক হিন্দু - মুসলমানের দ্বন্দ্ববিষয়ক। সুতরাং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেরূপ কটূক্তি হইত তাহা এই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক রচনায় অপরিহার্য।'[৫৪] সমর্থন যোগ্য। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আবার নাট্যকারের সমকালীন হিন্দু পুনরুত্থানবাদের ভাবও নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। নাটকের শেষে, ১মা যুবতী বলেছে, "হায় মহারাষ্ট্র যদি বর্গী নামে না বিখ্যাত হ'ত, যদি হিন্দু সন্তানসন্ততি তোমার আগমনে দস্যু বলে না পলায়ন করতো, যদি রাজপুত বিরোধী না হতে, শিখ সৈন্যে সম্মিলিত হয়ে মোগল বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে, যদি এই সৎনামী বিগ্রহে সহায় হতে, - হিন্দুস্থান হিন্দুর হত।" (পঞ্চম অঙ্ক। চতুর্থ গর্ভাঙ্ক) এই উক্তি স্বয়ং নাট্যকারের হলেই সঙ্গত হত।

নাটকমধ্যে কল্পনার প্রবেশ ঘটেছে প্রেমকাহিনীর আমদানির মধ্যে। রণেন্দ্র এবং মোগলদুর্গাধিপ কারতলব খাঁর কন্যা গুলসানার প্রেম সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। রোমান্সের নায়ক নায়িকার মতোই নায়কের আত্মবিস্মরণ এবং নায়িকার ভীষণ প্রতিহিংসাবিজড়িত দুর্বার প্রণয়। নাটকের শেষার্দ্ধে সৎনামী সম্প্রদায়ের বীরত্ব অপেক্ষা রণেন্দ্রগুলসানার চমকপ্রদ প্রেমকাহিনীই যেন প্রাধান্য পেয়েছে। গুলসানা সম্পূর্ণ রোমান্সের চরিত্র। বারাঙ্গনা মোহিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণবীর বারাঙ্গনার জীবিকা গ্রহণ এবং নারীদেহলুব্ধ পুরুষদের সৎনামীব্রতে দীক্ষাদানের ঘটনা ও কল্পনা প্রভাবিত -।

৫৪। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 'সৎনাম' (১৩১১ সালের সং, ভূমিকা)

আওরঙ্গজেবের গুলসানার সঙ্গে পরামর্শকরা, সম্রাটসভায় বৈষ্ণবীর প্রবেশ করে মৃত্যু বরণ প্রভৃতি ঘটনা ও কল্পনাপ্রধান। এতসব কাল্পনিক ঘটনার জন্যই সৎনামী নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও এটিকে ঐতিহাসিক নাটক না বলে ইতিহাসাশ্রিত নাটকের শ্রেণীভুক্ত করাই সমীচীন। নারী চরিত্র অদভুত বৈষ্ণবী এবং গুলসানার চরিত্রকল্পায়নের মাধ্যমে এই সত্য উদঘাটন করাই যেন এ নাটকে নাট্যকারের অভিপ্রেত।

সৎনামী নাটকটি পঞ্চমাঙ্কে সম্পূর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকে ঘটনার তীব্রগতি প্রথমাবধিই অনুভূত হয়। পঞ্চম অঙ্কটি দীর্ঘ এবং অতিনাটকীয় মৃত্যুর ঘনঘটায় পরিপূর্ণ। বহির্দ্বন্দ্বের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নাটকে স্থান পেয়েছে। রণেন্দ্রর দ্বিধা সৎনামীদের একটানা সাফল্যের স্রোতে বিপরীত তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। এ নাটকের উৎসাহব্যঞ্জক সঙ্গীতগুলি ও পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। গৈরিশ ছন্দে গ্রথিত নাটকের সংলাপে তীব্রতা সঞ্চারিত হয়েছে। চরিত্র সৃষ্টিতে রণেন্দ্র, চরণদাস, করিম খাঁ প্রভৃতি চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মানবিক ভালোবাসার প্রবৃত্তির সঙ্গে উচ্চলক্ষ্যের সংঘর্ষ রণেন্দ্র চরিত্রকে সজীব করে তুলেছে। চরণদাস ছদ্মবেশী মহাপুরুষ। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দেশ প্রেম এবং সরস কথাবার্তা, আকর্ষণীয় হয়েছে। করিম খাঁ প্রভুভক্ত কিন্তু কৌশলী। চরণদাস ও তার বুদ্ধির কাছে হার মেনেছে। আওরঙ্গজেবকে কূট চতুর বাদসারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে তাঁর চরিত্রের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা রক্ষা করা হয়নি। তাঁর প্রগলভতা পীড়াদায়ক।